প্রাচীর

অমল চন্দ্র চৌধুরী

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রাচীর ঃ
প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৭১

ইউনিক প্রেস,
অশোকনগর ষ্টেশন (যশোহর রোড)
উত্তর ২৪-পরগণা হইতে
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ।

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা — ৭০০০৭৩ হইতে
শ্রীবিশ্বরূপ ভৌমিক কর্তৃক প্রকাশিত ।

প্রচ্ছদ শিল্পী – শ্রীদিলীপ চৌধুরী
ব্লক প্রস্তুতি—শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য
ব্লক ছাপা—Jolly Art Press
7/1A. J. M. Mukherjee Road.
Calcutta — 700009

: ভূমিকা

শ্রীঅমল চন্দ্র চৌধুরীর 'প্রাচীর' নামে গল্পের বইটি হাতে এল। কতগুলি ছোট গল্পের সংকলন।

আমার সময় কম, দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ; তাই নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কিছু পড়ি না। কিন্তু এই বইর সবগুলি গল্পই পড়ে ফেলেছি।

লিখন শৈলী আধুনিকও নয়, সেকালেরও নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব। গল্পগুলি মামুলী বিষয়ে নয়—কয়েকটি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। তার মধ্যে 'অমায়িক' 'শিল্পী' 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ইত্যাদি বেশ মনে রাখবার মত। 'শিল্পী' গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, লেখক আন্দাজী লেখা লেখেন না, যাঁদের কথা লিখছেন তাঁদের জানেন, চেনেন।

আজকাল যে রকম ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে গল্প লেখার চল হয়েছে তাতে এই সরল সুন্দর গল্পগুলির নূতনত্ব আমার ভালো লেগেছে। গল্পগুলির স্বচ্ছতা, অকপটতা এবং বিষয়-বৈচিত্র্য সব নিয়ে পাঠকের ভালো লাগবে আশা করি, যদি অবশ্য পাঠকদের হাতে পৌঁছন যায়।

মৈত্রেয়ী দেবী

১০/৯/৮৬

প্রাচীর

ঃ সূচীপত্র ঃ

ঃঃ সমাপ্ত ঃঃ

প্রাচীর

সারাদিনের আপিসের কর্মক্লান্তি এবং ভীড়ের বাসে চড়ার পথশ্রান্তি নিয়ে সৌমেন যখন শহরতলীর আধা শহুরে, আধাগ্রামীণ পরিবেশের বাড়ীটার সদর দরজায় উপস্থিত হল, তখন প্রথম হেমন্তের সন্ধ্যা আসন্ন। কিন্তু দরজা পেরিয়ে প্রাঙ্গণে পা দিতেই তার মনে হল সমস্ত বাড়ীটা কেমন যেন থমথমে, একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা চারদিকে একটা অস্বস্তির গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। কাউকেই সে দেখতে পেল না; না মাকে, না রাধাকে।

গুটিগুটি পায়ে সে নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। খোলা দরজায় পর্দা ঝুলছে। আলো জ্বালাবার সময় হয়ে গেলেও তা জ্বালাবার যেন কারো দায় পড়েনি। পর্দা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে সে হাতের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখল। ভাবলো, রাধা হয়তো বিশেষ কাজে কাছেই কোথাও গেছে; এক্ষুণি এসে পড়লো বলে। তাই সে মেঝেতেই পায়চারী করছিল।

অন্যদিন আপিস থেকে বাড়ী ফিরতেই রাধা ছুটে আসে, আপিসের পোশাক বদলাতে কাপড় চোপড় হাতে তুলে দেয়। একটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েই থাকে। কিন্তু আজ এখনও তাকে দেখাই গেল না। আপিসের পোশাক ছেড়ে ফেলতে তার ইচ্ছেই হচ্ছিল না। জুতোটা খুলে ঐ পোশাকেই সে খাটের ওপর উঠে বসল।

শুধু যে ঘরে এখনও আলো জ্বালানো হয় নি তা-ই নয়, একটা জানলাও এখনও বন্ধ করা হয় নি। ঘরের পেছনের জংলা জায়গাটায় ক'দিন আগে একটা জোর বর্ষণ হয়ে যাওয়ায় আগাছাগুলো বেপরোয়া ভাবে বেড়ে গেছে। সেখান থেকে মশকের গুঞ্জন স্পষ্ট সৌমেনের কানে আসছে। অন্যদিন বেলা থাকতেই জানলা কপাট বন্ধ করে দেওয়ায় ওরা প্রবেশের পথ পায় না। আজ খোলা জানলা পথে ওরা বাইরের

পাট চুকিয়ে ঘরেই আশ্রয় নেবে। একটা খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে দূরের একফালি আকাশের ঘোলাটে রূপটা চোখে পড়ল। কোথায় যেন গৃহস্থ বাড়ীতে সন্ধ্যা কালীন হুলুধ্বনি উঠল। ক্রমে অন্ধকার নেমে এলো।

দু'একটা মশা সৌমেনের হাতে পায়ে পড়লেও তার তাড়াবার মতো ইচ্ছে হচ্ছিল না।

কিন্তু ব্যাপার কি? গোটা বাড়ীতে এমন নৈঃশব্দ কেন? তবে কি মা অসুস্থ হয়ে পড়ল? না রাধা দূরে কোথাও গেল? কিন্তু উঠে গিয়ে জানবার ইচ্ছে হলেও কেমন একটা অবসন্নতা সৌমেনকে যেন কিছুতেই খাট থেকে উঠতে দিচ্ছিল না। এখন ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার, নিঃশব্দ, নিঝুম। আজ আপিসেও দারুণ কর্মব্যস্ততা গেছে। আবার বাড়ীতে এসেও এ কী অস্বস্তি? সে যেন আর সহ্য করতে পারে না, টান হয়ে শুয়ে পড়ার মতও তার যেন শরীরে জোর নেই। একবার ভাবলো, না, এমন করেতো আর বসে থাকা যায় না। রাধাকে আজ কিছু কড়া কথা বলতেই হবে।

এমন সময় পর্দা ঠেলে কে যেন অতি সন্তর্পণে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে মেঝেতে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে কে এল, তা ঠাহর করা না গেলেও দীর্ঘ দিনের অভ্যাস থেকে সৌমেন বুঝতে পারল, রাধাই এসেছে।

সৌমেন জিজ্ঞেস করল, রাধা, মা সুস্থ আছে তো?

—হ্যাঁগো দাদাবাবু।

—তুই কোথায় গিয়েছিলি?

—বাড়ীতেই ছিলাম।

বাড়ীতে ছিলি, অথচ ঘরে আলো জ্বলে নি, জানলা বন্ধ হয় নি! তোর কি অসুখ করেছে?

প্রতিপক্ষের উত্তর এলোনা।

—কথা বলছিস না কেন? কি হয়েছে বল?

—তুমি জামাকাপড় ছেড়েছ, দাদাবাবু?

—না।

—ওগুলো ছেড়ে ফেলো।

—আগে বল, কি হয়েছে! তুই এলি না কেন? ঘরের এই অবস্থাই বা কেন?

—তুমি কাপড়-চোপড় ছাড়, বলছি।

—না, তুই আগে বল। এমন কি ঘটেছে যে, এতক্ষণ তোর দেখাই পাওয়া গেল না? উত্তরে রাধা একটি শব্দও করল না। অন্ধকার না হলে সৌমেন রাধার রক্তহীন, পাণ্ডুর আধোবদন দেখে হয়তো ভয় পেয়ে যেত।

—একটু পরেই দৃঢ়তার সাথে অথচ কোমল কণ্ঠে সে বললো, কি এমন হয়েছে, রাধা, যে, তুই আমাকে বলতে ভয় পাচ্ছিস? তোর কোন ভয় নেই, আমাকে বলে ফেল, কি হয়েছে?

—বলবো দাদাবাবু? আমার পরে রাগ করবে না তো? তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে নাতো?

—কেউ কি মারা গেছে রাধা?

—না দাদাবাবু।

—তবে কি হয়েছে? তুই এতো সংকোচ করছিস কেন?

—তুমি এখন ক্লান্ত দাদাবাবু। তাছাড়া এমনিতেই তো খুব একটা শান্তিতে নেই তুমি।

—ঠিক আছে, তুই বল। আমি যে-কোন দুঃসংবাদ সহ্য করতে পারব।

—পারবে তো?

—হ্যাঁ!

—দিদিমণি এসেছে, দাদাবাবু।

—দিদিমণি !!!

—হ্যাঁগো দাদাবাবু।

—কখন এসেছে? এখন কোথায়? কেন এসেছে? কি তার উদ্দেশ্য?

—দুপুরের একটু পরেই এসেছে। আমার ঘরে আছে। তোমার সাথে কি দরকার আছে।

—কি একটা অস্ফুট শব্দ করে সৌমেন টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। আর্তকণ্ঠে বলে, রাধা, তুই এখন যা।

—রাধা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

(দুই)

ক্রমে রাত বাড়তে থাকে। একটা ভীষণ নৈঃশব্দ দৈত্যের মতো সৌমেনের ঘরটার মধ্যে ভয়ংকর মূর্তিতে জেঁকে বসে। রাধা ঘরে আলো জ্বালাতে আসতে সাহস পায়নি, জানলাগুলোও বন্ধ করে যায়নি। একটা দুর্বিষহ যন্ত্রণায় সৌমেন ছটফট করতে থাকে। রাশি রাশি চিন্তা এক সংগে মাথার মধ্যে এলোপাথাড়ি জট পাকিয়ে তোলে। কপালের শিরাগুলো টনটন করে। না এ অসম্ভব, এ অসহ্য। আজ দু-বছর তার দিনগুলো এক রকমতো কেটেই যাচ্ছিলো। আঘাত, সংঘাত, সব কিছুইতো সে মানিয়েই নিয়েছিল। আপিস আর বই, রাধা আর মা, এইতো তার পৃথিবী। সে তো আর কিছু চায়নি। সব কিছুর সংগে, সবার সংগে, সে সব দেনা পাওনার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়েছে। ছিন্ন তানপুরা সে চিরদিনের জন্য তুলে রেখেছে, কল্পনার তুলিতে সে আর রং স্পর্শ করায় নি. নষ্ট নীড়ের খড়কুটো নিয়ে সে আর কলহ করতে চায় না। কিন্তু রাধা একী দুঃসংবাদ দিয়ে গেল! আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তো তার খুশি খুশি লাগছিল। আপিস থেকে ফেরার পথে যে ভালো বইটা কিনে এনেছে, অনেক রাত পর্যন্ত সেটা পড়বে বলে সে মনে করে রেখেছে। কিন্তু এমন অঘটন ঘটবে বলে তো সে ভাবেনি। যন্ত্রণার প্রথম বেগ কেটে যেতেই তার মনে পড়লো, আজ থেকে চার বছর আগের সেই দিনটির কথা, যেদিন সৌমেন তার প্রিয় বন্ধু অসিতকে নিয়ে সেই গণ্ড-গ্রামে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলো। ফিরে আসার পথে সে-ই

প্রথম অসিতকে বলেছিল, মেয়েটির মুখটি ভারী মিষ্টি। সংগী জবাব দিয়েছিল, এর মধ্যেই তুই কমেণ্ট করে বসলি! সৌমেন লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঐ মিষ্টি মুখটি ভেসে উঠতো। তার মনের সমস্ত কচি পাতাগুলোর মধ্যে যেন দক্ষিণা বাতাস বয়ে যেতো। মাস-খানেকের মধ্যেই সৌমেন বাপমরা মেয়ে বীণাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলো।

বীণাকে পেয়ে সৌমেনের কাছে পৃথিবীটা যেন নতুন রূপে, নবীন আশ্বাসে কানায় কানায় ভরে উঠল। তার মনে হল, এ পৃথিবীতে তার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। বীণা লাজুক, অমায়িক, স্বল্পভাষিণী। ছোট্ট সংসার নতুন করে সাজিয়ে নিয়ে সৌমেন চেয়েছিল তার মাকে সুখী করতে। মা-ও বীণাকে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিল। দু'একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকলে সৌমেন দেখতো বীণা গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছে। স্বামীকে দেখে সে চম্‌কে উঠতো।

ওকি, ভয় পেলে নাকি? চমকে উঠলে যে?

না—ভয় কিসের? চম্‌কাইনি তো।

দেখলাম, চমকালে।

ও তোমার ভুল।

যাক, সেই ভালো।

সমস্ত অন্তর দিয়ে, গভীর ভালোবাসা দিয়ে সৌমেন বীণাকে একেবারে আপন করে নিতে চেয়েছিল। সংসারের পনর আনা লোকই স্ত্রীকে পায় না। এ সত্যকে সৌমেন মানতে চায়নি। আর না হলে সে অন্তত ঐ এক আনার দলে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার ত্রুটিমাত্র করে নি। কিন্তু সৌমেনের সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। একদিন আপিস থেকে ফিরে এলে ভালো করে মুখ-আটকানো একখানা খাম রাধা সৌমেনের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, এটা তোমাকে দিতে বলে দিদিমণি কোথায় যেন গেছে। চিঠি পড়ে সৌমেন শুধু বিস্মিত ও হতবাকই হয়েছিল তা নয়, কি ভীষণভাবে যে সে ভেঙ্গে পড়েছিল, তার সাক্ষী মা ও রাধা। চিঠির প্রতিটি অক্ষর আজও সৌমেনের মনে স্পষ্ট হয়েই আছে।

অক্ষরগুলো বিছার মতো তাকে দংশন করেছিলো। আজও তেমনি দংশন করে।

শ্রীচরণেষু,

তুমি সবকিছু অকাতরে ঢেলে দিয়ে আমার জীবন কানায় কানায় ভরে দিতে চেয়েছ। বিনিময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি শুধু রাশি রাশি ফাঁকি। তুমি শুধু দিলেই, পেলেনা কিছুই। এ ছলনা ও অভিনয়ের মর্মবেদনা বয়ে বেড়াবার সাধ্য আমার ফুরিয়ে এসেছে। এত বড় ভালো-বাসার এতটুকু মূল্য-ও দিতে না পেরে আমি ঋণভারে জর্জরিত। তাই আর লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই, তোমার ভালোবাসার যোগ্য আমি নই। এক দেবতার চরণে নিবেদিত ফুল দিয়ে আর এক দেবতার পূজো হয় না। কারণ, একজনের প্রতি ভালোবাসা আমার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই রয়ে গেছে। নানা কারণে তার সঙ্গে আমার গাটছড়া বাঁধা পড়ে নি; বাঁধা পড়েছি তোমার সাথে সাতপাকে। ভেবেছিলাম, সংসারের আর পাঁচটা মেয়ের মতোই আমিও জোড়াতালি দিয়ে অভিনয় করেই তোমার সঙ্গে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু তোমার সান্নিধ্যে এসে দেখলাম, তুমি সৎ, মহৎ ও সরলপ্রাণ। তোমার প্রাণের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে তোমার সঙ্গে আমার অভিনয় করা সম্ভব নয়। তাতে শুধু অপরাধই হবে না, পাপও হবে। এ গুরুভার আর আমি বইতে পারছি না। তাই তোমার কাছ থেকে দূরে—বহুদূরে আমি চির-দিনের জন্য চলে যাচ্ছি। জানি, তুমি অত্যন্ত আঘাত পাবে। সহ্য করার সাহসও তোমার একদিন আসবে। সেদিন বিয়ে করে সংসারী হয়ো। তবে যাবার বেলা ছোট্ট একটা অনুরোধ রেখে যাচ্ছি, মেয়েদের অতো বিশ্বাস করবে না। অস্পৃশ্য যেমন বহুদূর থেকে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়, তেমনি তোমাকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। ক্ষমা চেয়ে আর লাভ কী?

ইতি—

বীণা।

তিন

তারপর দু'টি বছর সৌমেনের জীবন থেকে ঝরে গেছে, নতুন করে বিয়ে করার জন্য মা ও আত্মীয়-স্বজন চেষ্টার ত্রুটিমাত্র করেনি। কিন্তু সৌমেন বারবারই একটি উত্তর দিয়েছে, আর হয় না। মা পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকে, বাড়ীর সব কাজকর্ম করে রাধা। ঝঞ্ঝাটহীন, নিরুপদ্রব সংসার। বীণা চলে যাবার মাসখানেক পরেই আপিসের বড় বাবুকে ধরে বহুদূরে বদলি হয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় সে এসে উঠেছে। কারো সাথে বড় একটা মেলামেশা তার নেই। বই আর আপিস, আপিস আর বই নিয়েই তার জীবন। বীণার ফটোটা আজও দেওয়ালে টাঙানোই আছে। রাধা অনেকবার ওটাকে ফেলে দিতে চেয়েছে। সৌমেন হেসে বলেছে, ফটোতো পালাতে পারে না, ও থাক। হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে সৌমেন। কিন্তু কেন? কেন সে আজ আবার এখানে এসেছে? আমার কাছে তার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? তবে কি সে তার বিয়ের গয়নাগুলো নিতে এসেছে? না আমাকে কোন নতুন বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে এসেছে? আমার ঠিকানাই বা সে কেমন করে জানলো? একবার ভাবে, এক্ষুণি গিয়ে তাকে নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে। কিন্তু তার পা ওঠে না। এমন সময় হারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ওটাকে রেখে রাধা বললে, কাপড় ছাড়ো দাদাবাবু, খাবে। সৌমেনের যেন উঠবার কোন শক্তি নেই। উদ্যম নেই, সাহস নেই।

ওঠ দাদাবাবু, অনেক রাত হয়েছে। এবার সৌমেন সত্যিই উঠে পড়ে। কাপড় ছেড়ে বাইরে যায়। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে বলে, আমার খাবার এখানেই দিয়ে যা, রাধা। আজ খেতে বসে সৌমেন লক্ষ্য করল, রাধা একটুও দাঁড়াল না। কোন মতে দায়সারা কিছু খেয়ে সৌমেন উঠে পড়ে। রাধা ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা! তুমি খেলে না! ছিছি, না খেলে যে কষ্ট পাবে। না, আমিও গেলাম, তুমিও উঠে পড়লে। এমনটি বুঝলে আমি যেতাম না। খাটের ওপর বসে সৌমেন বলে, নে নে অনেক খেয়েছি, আর দরকার নেই। তুই আমাকে সিগারেটের প্যাকেট

ও ছাইদানিটা দে। একটা সিগারেট ধরাতেই দেওয়ালের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে সব কটা ঘণ্টা বেজে গেল।

এঁটো বাসন নিয়ে তুই চলে যা, রাধা। তুই শুয়ে পড়গে। এঁটো বাসন নিয়ে ঘর মুছে রাধা বেরিয়ে গেল। সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্নতা লাগছিল। একটু পরে রাধা আবার ফিরে এলো। দাদাবাবু, দিদিমণি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চায়। বলছে ভোরেই সে চলে যাবে।

সহসা এ কথার কি উত্তর দেবে, সৌমেন খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছু খেতে দিয়েছিস, রাধা?

এসেই আমার কাছে চেয়ে জল খেয়েছিল। একটু পরেই বললে, আজ দু'দিন আমি কিছু খাইনি। একটু খাবার দিতে পারিস, রাধা। আমি মুড়ি ও চা দিয়েছিলাম।

রাতে ভাত দিস নি?

খুব পীড়াপীড়ি করলাম; কিন্তু কিছুতেই সে খেল না।

দু'দিন না-খাওয়া, অথচ কিছুই খেলো না। তুই বল গিয়ে, ভাত না খেলে আমার সাথে দেখা হবে না।

রাধা চলে যাচ্ছিল, সৌমেন ডাকলো, এই শোন, খেতে দিয়ে একবার আমার কথা শুনে যাবি তো। সৌমেন চোখ বুজে কিছু সময় পরপর সিগারেটে টান দিচ্ছে; ঘড়ির পেণ্ডুলামটা টিক্ টিক্ করে এদিক ওদিক দুলছে। সন্ধ্যার গুমোটটা কেটে গিয়ে এখন যেন শীত শীত করছে।

একটু পরেই রাধা ফিরে এলো। কি খবর রাধা?

তোমার কথা বলায় হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছে।

ও এসেছে, মা টের পেয়েছে?

হ্যাঁ, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল।

মা কি বলেছে?

মা প্রণাম নেয় নি। বলেছে, আমার একটিমাত্র ছেলে, তুমি তাকে বিপদে ফেলো না, তুমি যেমন এসেছ, তেমনই চলে যাও।

তারপর?

আস্তে আস্তে আমার ঘরে গিয়ে বসেছে।

মা তোকে কিছু বলেছে ?

আমি কি করি দাদাবাবু ? মার কাছে আর ভয়ে আমি যাইনি।

ঠিক আছে, তুই এখন যা।

খাওয়া হলে দিদিমণি আসবে ?

আসুক, ভোরেই যখন চলে যাবে, তখন তো এখনই কি বলতে চায়, তা শোনা দরকার।

চার

একটা নিদারুণ অস্বস্তি ও দুর্ভাবনায় আধঘণ্টাখানেক কেটে গেল। পাড়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলোর ঘরে ঘরে নেমে এসেছে সুপ্তির প্রশান্তি। আর এ বাড়ীর এ ছোট্ট ঘরটিতে সৌমেন একটার পর একটা সিগারেট টেনে টেনে ধোঁয়ায় মাথাটা ঝাঁঝিয়ে তুলছে। হঠাৎ মনে হল দরজার পর্দার আড়ালে কে এসে দাঁড়ালো। আস্তে পর্দা সরিয়ে ঢুকলো সে, যে দুবছর আগে চিরদিনের জন্য এখান থেকে চলে গিয়েছিল। আস্তে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকানিটা এঁটে দিয়ে দরজার সাথে পিঠ দিয়ে এমনভাবে সে দাঁড়ালো যেন দেওয়ালে আঁটা ফ্রেমে বাঁধানো একখানা ম্লান ছবি। সৌমেন মুখ তুলে তাকালো। একী ! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক। কপালের ওপর ইতস্ততঃ বিন্যস্ত দু'একগাছি ঘন কালো চুল। সেই মিষ্টি মুখ ! সবই ঠিক তেমনি আছে ! শুধু একটু ম্লান। একটু বিষাদ ও অনেকখানি হতাশা মুখখানাকে ঘিরে আছে। বীণা অপলক নেত্রে সৌমেনের চোখের দিকে চেয়ে থাকে। দারুণ নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির শব্দগুলো ভয়ংকরভাবে কানে বাজে। সিগারেটের আগুন যখন এসে সৌমেনের আঙ্গুলে তাপ দিল, ওটাকে ছাইদানিতে না ফেলে আঙ্গুল থেকে খসিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল। বীণার শিথিল দেহটা পিঠ ঘসে ঘসে আস্তে আস্তে দরজার সাথে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো।

তুমি তো খুব ক্লান্ত, এখন গিয়ে রাধার ঘরে শুয়ে পড়। সকালে কথা হবে।

আমিতো ভোরেই চলে যাবো। তাই তোমাকে যা বলার এখনই বলে যেতে চাই।

তবে বলো। তুমি কি তোমার গয়নাগুলো নিতে এসেছ? তোমার একটা গয়নাও আমি নষ্ট করি নি। তুমি তো কিছু নিয়ে যাও নি। আর ঠিকানাও দাও নি যে, পাঠিয়ে দেব। তাই তোমার বাক্সের মধ্যে কাপড়-চোপড়, গয়না সবই আছে। আর তোমার বিয়েতে অন্য যেসব জিনিষ তোমার মা দিয়েছিলেন, সেগুলোও তুমি নিয়ে যেতে পার। তাছাড়া নগদ টাকা যদি তোমার দরকার হয়, তাহলে বেশী টাকা দেওয়ার মত সাধ্য আমার নেই; তবে ঠিকানা দিয়ে গেলে হাজার তু'এক টাকা ব্যাঙ্ক ড্রাফট করে পাঠিয়ে দিতে পারি। এখন বলো, তুমি কি জন্য এসেছ?

গয়না-গাটি, বিয়ের যৌতুক, নগদ টাকা, কোন কিছুর জন্যই আমি আসিনি।

তবে কেন এসেছ? আর ঠিকানাই বা যোগাড় করলে কেমন করে?

সে অনেক ইতিহাস। সেসব থাক। যাক্, তুমি আজকাল কোন খবরের কাগজ পড়?

যুগান্তর।

আজ থেকে তিনমাস আগে, জুলাই মাসের শেষ দিকে উত্তর ভারতে বড় রকমের যে রেলতুর্ঘটনা হয়ে গেল, সে সংবাদের কাগজটা তোমার কাছে আছে?

কেন বলো তো?

বলছি, একটু বের করো না।

সৌমেন উঠে গিয়ে তাকের পর থেকে খবরের কাগজের বাণ্ডিল টেনে একটা কাগজ দেখিয়ে বলে, এই তো উত্তর ভারতে ভয়ংকর রেল তুর্ঘটনার খবর।

এখানে যে মৃতের তালিকা আছে, তা থেকে আঠের নম্বরের নামটা দেখো তো।

হ্যাঁ! এই তো সুবীর মৈত্র (২৬)।

ঐ ওর সঙ্গেই আমি দু'বছর ছিলাম। দেরাদুনে বাসা করে থাকতাম। ও ছোট্ট একটি সরকারী চাকরি করত।

তারপর ?

তারপর সব শেষ।

এখন তুমি কোথায় আছ ?

দেরাদুনের পাট চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছি।

—কোথায় আছ এখন ? মার কাছে ?

—বছরখানেক হ'ল মা দেহরক্ষা করেছেন।

—তবে দাদার কাছে আছো ?

—দাদার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

—তোমার ছেলে-মেয়ে কোথায় ?

—হয় নি।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপকরে বসে থাকে। কারোর মুখেই কোন কথা জোগায় না। সৌমেন আর একটি সিগারেট ধরায়। খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট যে ক্ষতিপূরণ বাবদ একলাখ টাকা দিয়েছে, সে টাকাটা তুলেছ তো ?

—না।

তোলনি কেন ? ওর আত্মীয়-স্বজন কি দাবী করেছে ?

—ওরতো নিকট আত্মীয় কেউ ছিল না।

—মা—বাবা—ভাই কেউ না ?

—না।

—তবে তুললে না কেন ?

—প্রয়োজন বোধ করিনি।

—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ?

—না।

বর্তমান সরকারী নিয়ম অনুসারে তো তুমি একটা চাকরি পেতে পারো, তার চেষ্টা করেছো ?

—না।

—ওখানে কি নিজস্ব বাড়ীতে, না ভাড়াটে বাসায় ছিলে ?

—ভাড়াটে বাসা। ভাড়া মিটিয়ে বাসা ছেড়ে চলে এসেছি।

—চলে এসেছ ? এখন কি করবে ভেবেছ ?

—আমিতো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

—ভাবতেতো তোমাকে হবেই। আর আমার কাছেই বা এসেছ কেন ?

—কেন যে এসেছি—

—কোন পরামর্শ চাইতে ? আমি তোমাকে কি পরামর্শ দেব ? আর আমার কাছে তুমি পরামর্শ চাইবেই বা কেন ?

—কি করবো, একবার বলে দাও ?

—আমি বলে দেব ? তবে দেরাদুন ফিরে যাও, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নাও, স্বামীর চাকরির উত্তরাধিকার সূত্রে একটি চাকরি নাও।

—সে আমার স্বামী নয়। তার চাকরি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ক্ষতি-পূরণের টাকা কিছুই আমি স্পর্শ করবো না।

—স্বামী নয় !!!

—না।

—আবার নীরবতা নেমে আসে। সৌমেনের মুখে কোন কথাই যোগায় না। বীণাও কিছু বলতে পারে না। ঢং ঢং করে ঘড়িতে দু'টো বাজে। তাহলে এখন তুমি কি করতে চাও ?

কিযেন বলতে গিয়ে বীণার ঠোঁট দু'টো কাঁপতে থাকে। বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সে যেন বলতে চায়, ওগো আমার চিন্তা করার কোন সাধ্য নেই। তুমি বলে দাও, তুমি বলে দাও, আমি এখন কি করবো। তোমাকে যে-আঘাত আমি দিয়ে গেছি, তার যোগ্য পুরস্কার নিয়ে আমি তোমারই পায়ের তলায় ফিরে এসেছি।

—বল কি করতে চাও ?

—বীণা মাথাটা আস্তে আস্তে দু'হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে। কথা বলে না

—অমন করে হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়ে থাকলে তো চলবে না, রাত শেষ হয়ে এলো। আমি বলছি, আপাতত: তোমার গয়নাগুলো নিয়ে যাও।

আর ঠিকানাটা দিয়ে যাও। তোমাকে যতটা পারি টাকা পাঠিয়ে দেবো।

ও-সব কিছুর জন্য আমি তোমার কাছে আসিনি।

—তবে কিজন্য এসেছ, বল ?

—আমাদের মতো মেয়েদের একটা আশ্রয়ের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়, বলতে পার ?

—আমার জানা নেই।

—আমার আশ্রয়ের একটা সন্ধান দাও।

—এতবড় দায়িত্ব কোন্ ভরসায় আমার ওপর চাপাচ্ছো ? কোন্ অধিকারেই বা ?

—একদিন আমাকে ভালো বাসতে, সেই অধিকারে।

—সে সবতো শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

—একদিন তো ছিল, অন্ততঃ সে দিনের অধিকারেই আমি এসেছি।

—আমি দুঃখিত, তোমাকে কোন সাহায্য আমি এ ব্যাপারে করতে পারবো না। আমার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব, আমি তা বলেছি। তুমি তা নিয়ে যেতে পারো। অন্য কোন সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—এতবড় অপরাধ করেও তোমার কাছে ফিরে এসেছি। এই জেনে যে, তুমি তোমার মর্যাদা নষ্ট হয় এমন কোন আচরণ করতে পারবে না।

—আমার কোন্ মর্যাদা রক্ষা করার জন্য তুমি এসেছ ?

—উত্তরে স্থির অপলক দৃষ্টিতে বীণা সৌমেনের দিকে তাকাল। বীণার দুটি চোখের মধ্যে দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত এক ঊষর প্রান্তর সৌমেনের চোখে পড়লো। সেখানে জল নেই, গাছ নেই, লতা-পাতা নেই। শুধু খাঁ খাঁ করছে। একটা ভয়ংকর রিক্ততায় সৌমেনের বুকের ভেতরটা একবার হু হু করে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রি রি, ঘিন ঘিন করে উঠলো। মনে হলো জগৎ মিথ্যে—সংসার সমাজ সব বৃথা। সমাজ ও ভালোবাসা মেকি। সর্বত্র শুধু ফাঁকি আর ধোকা। ভালোবাসা পশুপ্রবৃত্তির নামান্তর। বিয়ে যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ ছাড়া আর

কিছুই নয়। এই ছলনাময়ী সর্পিণী মহিলাটিকে ঘাড় ধরে এই মুহূর্তে বাড়ীর বাইরে দিয়ে আসা উচিত। মানুষের প্রতি দয়া, মমতা, করুণা সব পাপ; আদিম যুগের দুর্বলতা মাত্র। সৌমেনের জীবনে ভালোবাসার সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল, এই বিশ্বাসঘাতিনী সেই অমৃত-ভাণ্ড চুরি করে পালিয়ে গেছে। রেখে গেছে গরল। চন্দ্র-চূড়শিব গরল কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু সৌমেনের এই বিষ সহ্য করার মত গিরিশের ন্যায় মহাতেজ নেই। তাই সে বিষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। আজ কোন্ নতুন ফাঁস পরাবার জন্য এ ছলনাময়ী আবার এসেছে নতুন অভিনয় করতে, মঞ্চের অভিনেত্রীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে ভালোই লাগে ; কিন্তু বাইরে রূঢ় বাস্তবে তার মূল্য কতখানি? উত্তেজনায় অস্থির হয়ে সৌমেন দ্রুতপদে মেঝেতে পায়চারি করতে থাকে।

—না বীণা! আমার কাছ থেকে অন্য কোন পরামর্শ তুমি পাবে না। রাত শেষ হয়ে এলো। তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। সকাল হলে যেন তোমাকে এ বাড়ীতে না দেখা যায়। তোমার প্রতি আমার কোন রাগ বা ক্ষোভ নেই। তোমার কোন ক্ষতি হোক, আমি তা চাই না।

—আমার অপরাধের কোন ক্ষমা হয় না। তাই ক্ষমা চেয়ে তোমাকে উত্যক্ত করতে আমি চাই না।

—যাক, এখন তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।

আবার একটা অসহ্য নিস্তব্ধতা ঘরের মধ্যে নেমে আসে। সৌমেন পায়চারি করেই যাচ্ছে। এক সময় সে থমকে দাঁড়ায়। খুব কোমল কণ্ঠে বলে, তুমি খুব ক্লান্ত। যাও, এখন গিয়ে শুয়ে পড়। আর একবার বীণা সৌমেনের মুখের দিকে তাকায়। সৌমেনের যেন সব ঝাপসা মনে হয়। মনে পড়ে, এমন একটা মুখ সে যেন কবে কোথায় দেখেছিল। স্মৃতির গহনতলে সে প্রাণপণে হাতড়াতে থাকে—কবে, কোথায়, কেমন করে? একটু স্পষ্ট হয়ে আসতেই আবার সব ঝাপসা হয়ে যায়।

ততক্ষণে বীণা উঠে দাঁড়ায়। ছিটকানি খুলে দরজা ফাঁক করে পর্দা সরিয়ে অত্যন্ত ধীর পায়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

(পাঁচ)

পরদিন আপিস থেকে ইচ্ছে করেই একটু দেরী করে সে ফেরে। সৌমেন ফিরে দেখে ঘর নির্জন, আলো জ্বলছে। রাধা এগিয়ে আসে নিত্যকার মত সাহায্য করতে। হাত-পা ধুয়েই চা খেতে খেতে বলে, কাল রাতে আর ঘুম হয়নি, রাধা।

—আমারইবা ঘুম হ'ল কই। আমিতো বসেই ছিলাম। দিদিমণি ফিরল সেই শেষ রাতে।

—যাক্। কখন গেলরে রাধা?

—কে, দাদাবাবু?

—কেন, তোর দিদিমণি!

—সে তো যায় নি।

যায় নি?

—না।

—কেনরে?

—শরীরটা খুবই খারাপ, একটু জ্বরও হয়েছে। তাছাড়া কথাবার্তা তো একরকম বলেই না। সারাদিনে কিছু খায়ওনি।

—জ্বর হয়েছে? এখন কি জ্বর আছে?

—তাতো ঠিক বলতে পারবো না।

—যাক্ গে। মা তোকে কিছু বলেছে?

—মা অত্যন্ত গম্ভীর। কিছুই বলছে না। দুপুরের দিকে মার কাছে গিয়েছিল দিদিমণি।

—কোন কথা হয়েছে?

—হয়েছে। দিদিমণি বলেছিলো, আমি যে-অপরাধ করেছি, তোমার যদি কোন মেয়ে থাকতো, আর সে যদি তা করতো, তাহলে তুমি কি করতে, মা?

—মা কি বললে ?

—মা বললে, অমন মেয়েকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতাম।

—উত্তরে দিদিমণি বলেছে, আমি কিন্তু তোমার মেয়ে, মা। তোমার পায়ের তলায়ই আমি পড়ে থাকবো।

—তা হয় না বাছা।

—সন্তানকে মায়ের অদেয় কিছুই নেই। এই কথা বলে দিদিমণি মার কাছ থেকে ফিরে এসেছে।

(ছয়)

মাস খানেক পরের কথা। সকালে এক পশলা বিষ্টি হয়ে এখন চকচকে রোদ উঠেছে। সৌমেন তার ঘরে এসে নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজ পড়ছে। আজ ছুটি। বাইরে যাবার তাড়া নেই। রোদে দেবার জন্য বিছানাপত্র নিতে রাধা ঘরে ঢুকলো।

—দোকান থেকে সিগারেট এনে দিতে পারিস, রাধা ?

—তুমি আজকাল অনেক সিগারেট খাও, দাদাবাবু। এখনতো আমি যেতে পারবো না। তবুতো ফুরসুৎ পাচ্ছি। কারণ দিদিমণি অনেকখানি কাজ নিজেই করে।

—তাকে কে কাজ করতে বলেছে ? ডাক্তার না পুরো বিশ্রাম নিতে বলেছে। অত বড় একটা অসুখ থেকে সবেমাত্র উঠলো, এর মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেছে ?

—আমি তো পই পই করে নিষেধ করি, কিন্তু আমার কথা শোনে না।

তুই যা। বল্‌গে, আমি নিষেধ কর্‌ছি। রাধা চলে যায়।

বীণার সেই যে একটু জ্বর হয়েছিল, তাই দু'একদিনের মধ্যে বড় আকারে দেখা দিল। তারপর টাইফয়েড। ডাক্তারে-যমে টানাটানি। কুড়ি বাইশ দিন রাধার প্রাণপণ যত্ন ও সেবায় সেরে উঠেছে। কিন্তু শরীর এখনও ঠিক হয়নি। অথচ সে এরই মধ্যে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে।

এ অবস্থায় সৌমেন তাকে চলে যেতে বলতে পারে নি। আর দু'চারদিন পরে তাকে চলে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় কি?

(সাত)

মাঘ মাসের প্রথম ঠাসাশীত পড়েছে। সৌমেন আজকাল একটু রাত করেই বাড়ী ফেরে। আজকে ফিরেই সোজা সে রাধার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—রাধা ঘরে আছিস? শোন্!

—বলো।

—তোর দিদিমণি কোথায়?

—মায়ের ঘরে!

—মায়ের ঘরে!

—হ্যাঁগো, দাদাবাবু।

—দিদিমণি মাকে রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছে।

—শোন্, তোর ঘরে ফিরে এলে বলবি আমার কথা। আগামী রবিবারের মধ্যেই তাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ কিছুতেই চলতে পারে না। এ আমি চলতে দেব না। আর মায়েরই-বা কি হল? যত সব!

হন্ হন্ করে সৌমেন নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ভাবে, মা কেমন করে একে সহ্য করে।

শীতের দাপটে অল্প রাত্রিতেই নিশীথের নিস্তব্ধতা নেমে আসে। সৌমেন এ-পাশ ও-পাশ করে, ঘুম আসে না। তার মনে হয় কোন্ এক আদিমকাল থেকে সে যেন এক বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছে। পথ যেন আর শেষ হয় না। বোঝাও সে আর বইতে পারে না। আর কতদূর! আর কতদূর! এমনই করে কতদিন আর তাকে এ দুর্বিষহ বোঝা মাথায় নিয়ে গন্তব্যস্থলহীন পথে এগিয়ে যেতে হবে! না, সে আর ভাবতে পারে না। পথ তাকে একটা বের করতেই হবে। এ বোঝা তাকে নামাতেই হবে। মা প্রায় পঙ্গু। তার মানসিক বিকৃতি খুবই

স্বাভাবিক। রাধা যতই সাহায্য করুক না কেন, শত হলেও সে এ বাড়ীর ঝি বৈতো নয়। কিন্তু আমি? আমি একটি অথর্ব, পঙ্গু। অক্ষম স্থবিরের মত একি করে যাচ্ছি? রাধার ঘরে থাকতে থাকতে মাকে জয় করে বসেছে। এর পর একদিন হয়তো ঐ ভয়ংকরী ডাইনী ওর বিষদাঁত এবং সুতীক্ষ্ণ নখর নিয়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসবে। না না না, তা হতে পারে না। তা আমি হতে দেব না। আমি নিষ্পত্র, বিশুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষ। আমার ছায়া নেই, মায়া নেই, রস নেই। আমি হোমাগ্নির ইন্‌ধন বৈতো নই। ভীষণ যন্ত্রণায় মাথার শিরা—উপশিরা গুলো টন্ টন্ করতে থাকে সৌমেনের।

(আট)

বৈশাখ শেষ হয়ে জ্যৈষ্ঠ ছুঁই ছুঁই করছে। দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টির শেষে দাবদগ্ধ ধরণীর বুকে আজ সন্ধ্যা থেকেই নেমেছে জোর বর্ষণ। বিশুষ্ক পৃথিবী যেন আকণ্ঠ নব-বর্ষার বারিধারা পান করে পরমতৃপ্ত। দারুণ গ্রীষ্মের শেষে প্রচণ্ড বর্ষার ফলে যে-ঠাণ্ডা নেমেছিল তাতে করে পরম শান্তিতে সৌমেন ঘুমোচ্ছিল। গভীর রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখলো, খোলা জানলা পথে খানিকটা চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু জানলাটা তো বন্ধ ছিল। খুললো কি করে! সে বিছানায় উঠে বসলো। তার মনে হল, জানলার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটা সৌমেন ভয় পেল। ভয়ের ভাবটা কেটে গেলে সে বললো, কে ওখানে দাঁড়িয়ে? খুব ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব এলো, আমি।

—আমি কে? বীণা?

—হুঁ।

—তুমি এলে কি করে?

—ঘুম আসছিলো না। বাইরে এসেছিলাম। দেখলাম, তোমার ঘরের দরজা খোলা, ভয় হল, চোর ঢুকেছে নাকি। কাউকে না ডেকে এগিয়ে এলাম। হারিকেনটা বাড়িয়ে দেখলাম, চোরটোর কিছুই নেই,

তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছ। দরজা দিতে মনে হয় ভুলে গেছ। দরজা আটকাবার জন্য ঘুমভাঙ্গাতেও কষ্ট হচ্ছিল। দরজা খোলা থাকাও নিরাপদ নয়। তাই জানলায় দাঁড়িয়ে ঘর পাহারা দিচ্ছিলাম, আর চাঁদের জোছনা খোলা জানলা দিয়ে প্রাণ ভরে দেখছিলাম।

—ভালো করোনি। রাধাকে ডাকিয়ে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এত রাতে আমার ঘরে আসা কিছুতেই তোমার ঠিক হয় নি।

বীণা জানলার শিক ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সৌমেনের মুখ সে দেখতে পায় না। কিন্তু সৌমেন বীণার মুখখানা স্পষ্ট করেই দেখতে পায়। হঠাৎ যেন সৌমেন কেমন দুর্বল হয়ে পড়ে। জোছনায় তাকে পুরোপুরি দেখা যায়।

—বীণা !

—বলো, কি বলবে ?

—একটু এগিয়ে এসে সে মেঝেতে বসে পড়ে।

—ভোরেই চলে যাব বলে, আজ সাত মাস হয়ে গেল। তুমি আর কতদিন এ বাড়ীতে থাকতে চাও ? এ বাড়ীর একটা ঝিয়ের সাথে থাকতে লজ্জা করে না ? তুমি আমার পঙ্গু মাকে কি করে বশ করেছ ? তুমি যদি স্বেচ্ছায় না যাও, তবে আমি বাধ্য হবো জোর খাটাতে।

প্রতিপক্ষ কেবল মাথা নীচু করেই বসে থাকলো। তার নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

—বল, উত্তর দাও। কবে যাবে ?

—আমি তোমার তো কোন ক্ষতি করছি না। তোমাকে কোন রকম উত্ত্যক্ত করছি না। আমি তো দ্বিতীয় রাধা হয়েই মায়ের পায়ের তলায় ঠাঁই নিয়েছি।

—চোরের মত আমার ঘরে এসেছ কেন ?

—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি এ সব কথা বলো না। আমি তো তোমার কাছে কিছু চাই না। তোমার কিছু চুরি করতেও আমি আসিনি।

—তুমি কবে যাবে বলো ?

—আমি তো চলে যেতেই বসেছিলাম। তুমি ডাক্তার আনলে কেন ?

—মানবিক কারণে। তোমার কারণে নয়।

—একথা সত্য নয়। শুধু মানবিক কারণে তুমি ডাক্তার আননি। তুমি আমাকে ঘৃণাও কর, আমাকে পুরো ভুলতেও পারো না।

সৌমেন লাফ দিয়ে বিছানা থেকে মেঝেতে পড়ে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মিথ্যে কথা। আমি ভুলে গেছি। একেবারেই ভুলে গেছি। সাত মাসেও তোমার যাওয়ার সময় হয় নি। তোমাকে যেতেই হবে।

—দেখ, তোমার গভীর ভালোবাসার প্রতি সম্মান দেখাতেই একদিন আমি সরে গিয়েছিলাম। আবার সেই ভালোবাসার টানেই আমি বিধাতার রুদ্ররোষে এখানে এসে ছিটকে পড়েছি। তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমার কাছে কিছু চাই না, শুধু দূর থেকে তোমাকে একবার করে চোখে দেখতে চাই।

—তুমি এতো মহৎ ?

সৌমেনের প্রশ্নটির মধ্যে যে তীব্র ব্যঙ্গ ছিল তা বিষাক্ত ছুরির মতো বীণার বক্ষ বিদীর্ণ করে দিল।

—না গো, আমি মহৎ নই। আমি অতি ঘৃণ্য। আমি পাপী। অত্যন্ত নীচ।

—তবে আমার কাছে কেন ?

মহতের স্পর্শে আমার ইহকাল পরকালের পাপ ধুয়ে মুছে যাবে।

সৌমেন আবার বিছানায় বসে পড়ে। কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে হাঁপাতে থাকে। বীণা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ায় বাইরের দিকে। বলে যায়, দরজাটা দিয়ে শুয়ে পড়ো।

বাইরে বারান্দায় গিয়ে বীণা দেখে, পৃথিবী কি অপরূপ সুন্দর। জোছনায় প্রাঙ্গণ ভরে গেছে। গোটা বাড়ী হাসছে। নৈশ আকাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে যেন তাকিয়ে আছে। সে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

তার জীবনের সাথে এ সৌন্দর্যের মিল কোথায়? এমন রমণীয় নিশীথিনীর চন্দ্রালোক তার কাছে হঠাৎ বিষাক্ত হয়ে ওঠে। বুকের ভেতর তোলপাড় করে। তার তো সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে কোথাও একটু জোছনা নেই। কেবল অতলান্ত তমসার অন্ধ যবনিকা। সে কোথায় যাবে? কোন্ পথে, কত দূরে? ঐ যে পেছনে রুদ্ধ দরজার ওপারে যে-লোকটির সাথে তার একদিন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিল, সে আজ কত লক্ষ যোজন দূরে সরে গেছে। আর কি কোনদিন মরীচিকার ছলনা ছাড়া তার কিছু প্রাপ্য জুটবে? ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে অন্য ব্যক্তিটি খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে দূরের ঝাউগাছটার দিকে চেয়ে আছে। গাছটার মাথায় খানিকটা কুয়াশার মতো মনে হচ্ছে। ওর নিজের জীবনও কি অমনই একটা কুয়াশার আবরণেই চিরদিন ঢাকা থাকবে? সৌমেন চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়; কিন্তু বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিতে পারে না। ঘরের মধ্যে একটা দারুণ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কি যেন এইমাত্র হারিয়ে গেল। কি যেন পেয়েও পেল না সে।

(নয়)

বর্ষা শেষ হয়ে কাশ, শিউলি ও আগমনীর আনন্দ নিয়ে এসেছে শরৎ। শিশিরসিক্ত লতাগুল্ম ও পত্ররাজির ওপর সোনালী রোদের লুকোচুরি। আকাশে সাদা মেঘের অবিরাম আনাগোনা, সকালবেলায় শিশিরভেজা প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ বাঙালীমাত্রকেই আনমনা করে তোলে। প্রবাসীদের ঘরে ফেরার পালা। পুরাতনকে নতুন করে বুকে পাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন চলে। সৌমেনদের পাড়ায়ও কৈলাসবাসিনী মহামায়ার আরাধনার আয়োজন হয়েছে। তবে বহু কষ্ট করে এ পূজোয় মাইক বন্ধ করে ঢাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ মহাসপ্তমী। ঢাকের বাজনা বাজছে। সৌমেনের আজ ছুটি। দুপুর বেলা ঘরে বসে সে যেন কিসের হিসেব মিলাচ্ছিল। এমন সময় দরজার পর্দা একটু ফাঁক করে বীণা শুধাল, এই, একটিবার ঘরে আসবো?

সৌমেন মুখ তুলে দেখলো, বীণা হাসছে। কিছুতেই সে না করতে

পারলো না। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বল্‌লো, এসো। এসেই সৌমেনের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বললো, দেখ, এই শাড়ীটা মা আমাকে পূজোয় কিনে দিয়েছেন।

—তোমার পছন্দ হয়েছে ?

—খুব। অনেকদিন আগে বাড়ীতে পূজোয় আমার মা এরকমই একটা শাড়ী কিনে দিয়েছিল।

যাক্‌, খুশী হলেই ভালো।

—বীণা দু'হাতের আঙুল দিয়ে শাড়ীর আঁচলের প্রান্তটি মসৃণ করছিল।

—সৌমেন লিখতে লিখতেই বললো, আর কিছু বলবে ?

—না।

—তাহ'লে—

—না, আমি বলছিলাম কি, আজ বছরের একটা দিন তো, তুমি যদি অনুমতি কর, তবে—

—তবে কি ?

—আজ আমি পূজোর উপোস করছি। এইমাত্র স্নান করে এসে মায়ের দেওয়া কাপড়খানা পরেছি। তুমি একটিবার অনুমতি কর, আমি তোমাকে প্রণাম করবো।

—তোমার একি পাগলামি !

—পাগলামি নয়, এ আমার একান্ত ইচ্ছে।

এবার সৌমেন বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কর্কশ কণ্ঠেই বললো, না, তা হয় না। মাকে গিয়ে প্রণাম কর।

—পাথরের মূর্তির মতো অচঞ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বীণা। তারপর পাথরের চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে গড়িয়ে আসে অশ্রুবিন্দুগুলো। তারপর গলায় আঁচল টেনে দিয়ে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে মাথা রেখে সৌমেনের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে যখন দ্রুত ঘর থেকে বীণা বেরিয়ে গেল, তখন সৌমেনের বুকের ভেতরটায় একটা মোচড় দিয়ে উঠলেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো, ভালোই হ'লো।

(দশ)

আজ দশমী। আজ ভোর থেকেই প্রবল বর্ষণ চলছে। সন্ধ্যার কাছাকাছি তা প্রবল ঝড়ের আকার ধারণ করলো। প্রশান্ত প্রকৃতি রুদ্র মূর্তিতে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। আজ মায়ের মূর্তি বিসর্জন দেওয়াও সম্ভব হয় নি। সন্ধ্যায় পূজামণ্ডপে ঢাকে কাঠি পড়ে নি। মাকেও কেউ বরণ করতে আসে নি। সন্ধ্যার পর কোনো রকমে কিছু খেয়ে ঘরের মধ্যে গুটি-সুটি বসে সোমেন একটা পুরান মাসিক পত্রিকার গল্প পড়ছিল। ঝড়ের দাপটে চারদিক যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। রাত যতই বাড়ছে ঝড়ের প্রকোপও ততই বেড়ে চলেছে। রাত ১০টার দিকে সোমেনের দরজায় দমাদম আঘাত শুনে সে উঠে এসে দরজা খুলে দিতেই প্রবল বাতাসের ধাক্কায় বীণা ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়লো। অনেক কষ্টে দরজাটা বন্ধ করে সোমেন জিজ্ঞেস করলো,—কি ব্যাপার? এ প্রবল ঝড়ের মধ্যে তুমি এলে কি করে?

—রাধা তার ঘরে। আমি মায়ের ঘরেই ছিলাম। মা বারবার ছটফট করছিলেন, তুমি কেমন আছো সে-সংবাদ জানবার জন্য। তাই আমাকেই পাঠালেন, তোমাকে বলে যেতে, ঝড় না থামা পর্যন্ত তুমি যেন না শুয়ে পড়। ঝড়ের সময় শুতে নেই।

—আমি তো শুইনি। গল্প পড়ছিলাম।

—আমিও মাকে রামায়ণ পড়ে শুনাচ্ছিলাম।

—আর কতদিন মাকে রামায়ণ শুনাবে? সপ্তকাণ্ড কি শেষ হবে না?

—সপ্তকাণ্ড শেষে তো সীতার পাতাল প্রবেশ।

—সীতা কি তবে আবার অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠা চায়?

—না। অতো বড়ো সাহস সীতার নেই।

হঠাৎ বীণার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে যেন কি বলতে চায়, বিড বিড় করে বলতেও থাকে; সোমেন শুনতে পায় না।

ঝড় বেড়েই চলেছে। আরও জোরে, আরও জোরে। এতো ভয়ঙ্কর ঝড়েতো সামান্য দালান টিকবে না। ঝড়ের বেগে বীণা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে যাবার চেষ্টা করে। এক প্রবল ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে সে মেঝেতে

ছিটকে পড়ে। প্রচুর জল, গাছের ছেঁড়া পাতা, আবর্জনা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সৌমেন লাফ দিয়ে পড়ে দরজা আটকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবল বাতাসের সাথে লড়াই করে সে যখন দরজা বন্ধ করলো তখন জলস্রোত বীণাকে একেবারেই সিক্ত করে দিয়েছে।

ঘরের মেঝেতে তখন প্রচণ্ড জল জমে গেছে। স্থির অচঞ্চল ভাবে বীণা নিরুপায়ের মতো মেঝেতে বসে আছে। তার সিক্ত মুখমণ্ডলে তু'চারটি বারিবিন্দু অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সৌমেন তাড়াতাড়ি বীণার চাবির থোকা বের করে বহুদিন পরে বীণারই বাক্সটা খুলে ফেললো। তারপর তার ভেতর থেকে একখানা শাড়ী, একটা ব্লাউজ ইত্যাদি বের করে দিয়ে বললো, "ওঠ, কাপড় ছাড়ো"।

—না। সে কি করে হয়!

—আমি বলছি, ছাড়ো। এ তোমারই কাপড়। তুমি পরবে না বলছো কেন?

—ও যার কাপড় সে মরে গেছে।

—হেঁয়ালি রাখো, এভাবে আর কিছু সময় থাকলেই আবার টাইফয়েড হয়ে যাবে। তা আমি হতে দেব না। শীগ্‌গির ওঠো।

—তবু বীণা নিশ্চল মূর্তির মতোই বসে থাকে। হঠাৎ তার একখানা হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সৌমেন বলে, এক্ষুণি কাপড় ছাড়ো। নইলে হয় তোমার মাথায় বাড়ি দেব, না হয় আমার মাথায়। বীণা স্বপ্নাবিষ্টের মতো ভাবে, ওগো নিয়ে চলো, নিয়ে চলো, এই হাত ধরে যতো দূর খুশী, যেখানে খুশী নিয়ে চলো। আমি আর পারি না। জীবনে বহু বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছি। এ বিশ্ব সংসারে আজ আর কেউ নেই। শুধু তুমি, কেবল তুমি। মাথা তুলে সৌমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে সে অবোধ শিশুর মতো ভিজে কাপড় ছেড়ে—শুকনো কাপড় পরে, মাথাটা গামছায় মুছে চুপটি করে এসে দাঁড়ায়।

—এবার আমি যাই।—মা একলা রয়েছেন। ভয় পাবেন।

—ঝড় তোমাকে যেতে দিচ্ছে না। বাইরের প্রকৃতি কি অস্বাভাবিক-ভাবে ক্ষেপে উঠেছে, তা তুমি বুঝতে পারোনি! ঝড় না কমা পর্যন্ত

এখানেই তোমাকে থাকতে হচ্ছে। আমি বসে আছি। তুমি শুয়ে পড়ো। সঙ্গে সঙ্গে বীণা আর্ত চিৎকার করে ওঠে। না, সৌমেন, না, তা হয় না।

—সৌমেন দৃঢ়তার সাথে বলে, হয় না কেন ? তর্ক করো না। লক্ষ্মী মেয়েটির মতো চুপটি করে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

—বীণা আর একবার সৌমেনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পলকহীন ভাবে অবলোকন করে।

—যাও শুয়ে পড়ো। এখানে চেয়ারে বসেই আমি রাত কাটিয়ে দেবো।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বীণা দাঁড়িয়েই থাকে। আর, খাটের একটা পায়া ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সৌমেন। ঐ যে খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ও কে ? সেই বীণা, যাকে ঘিরে আমার একদিন কত স্বপ্নই না ছিল ? এইতো সেই মিষ্টি মুখ, চোখ বুজে আমার দিকেই মুখ করে আছে! গলার কাছে শাড়ীর হংসমিথুন-আঁকা পাড়টি কি চমৎকারই না দেখাচ্ছে। গলার তলায় পেলব অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। আর একটু নীচেই তো আঘ্রাত, অথচ মহাপূজার দু'টি সুপুষ্ট ফুল। সৌমেনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার কেঁপে ওঠে। বালিশের তলা থেকে দিয়াশ-লাইটা বের করে একটা সিগারেট ধরায়। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। একবার ভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে কাছে টেনে আনে। আবার কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। মনে হয়, সূচী-ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সেই আদিম কালের দু'টি সরীসৃপ যেন জেগে উঠেছে আপন দুর্নিবার সত্তায়।

সৌমেন পায়চারি করতে থাকে। দরজার তলা দিয়ে জলের ক্ষীণ স্রোত এসে মেঝে ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোয় জল চক্‌চক্ করতে থাকে। ওর মধ্যেই সৌমেন এদিক ওদিক হাঁটে। সিগারেটের ধোঁয়ায় মাথা তার ঝিম ঝিম করে। আর একটা সিগারেট ধরায়। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি, মাতামাতি সমানে চলতে থাকে, আর ভেতরে সৌমেনের মাথার মধ্যে রক্তের বেগ ঝড়ের চাইতে প্রবলতর

হয়। সে একবার বীণার মুখের দিকে তাকায়। স্থির নিশ্চল প্রতিমার মতোই সে দাঁড়িয়ে আছে। বিষ্টিধোয়া দেহটা কি ভীষণ পেলব লাগছে। মাথার মধ্যেটা কেমন ঘুরপাক খায়। দ্রুত গিয়ে সৌমেন বাক্স খোলে, সেই বিয়ের হারটা বের করে এনে বীণার গলায় পরিয়ে দেয়। বীণাও কোনরকম বাধা দেয় না।

—যাও, এবার শুয়ে পড়ো। দেরী করো না।

—তা হয় না। তুমি ভুল কচ্চ। শান্ত হও।

—তুমি শুয়ে পড়ো বীণা।

—না, তা হয় না। তুমি যা ভেবেছো, তা আমি নই।

—তার মানে? তুমি কী বলছো?

—মানে? তোমার কাছে আমার কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। শুধু আশ্রয়ই আমি চেয়েছি তোমোর কাছে, অধিকার চাই নি। মা আশ্রয় দিয়েছেন, আর তোমাকে দূর থেকে প্রতিদিন দেখার সুযোগ পেয়েছি। এর বেশী আর কিছু আমি চাই না।

—তুমি শুয়ে পড়ো, না হয় আবার অসুখে পড়বে।

—ঝড় কমলে রাধার ঘরে গিয়েই শোবো।

—এ ভীষণ ঝড় কখন কমবে কে জানে। সারারাত ঝড় হ'লে সারা-রাতই তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে?

—যা একদিন ছেড়ে গিয়ে পাপ কুড়িয়েছি, পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে তা আর স্পর্শ করবো না।

—তুমি শুয়ে পড়ো বলছি। আমি চেয়ারে বসেই বাকী রাতটা কাটাতে পারবো।

—তুমি বরং শুয়ে পড়ো, আমিই চেয়ারে বসে থাকি।

—তুমি অসুস্থ, আবার ভিজেছো।

—অসুস্থ হ'লেও দেবতার আসন ছুঁয়ে তাকে অপবিত্র করার অধিকার আমার নেই।

সৌমেন বীণার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সে কাঁপতে থাকে। লক্ষ্য করে, বীণাও থরথর করে কাঁপছে। সে যেন কি বলতে চাইছে,

পারছে না। সৌমেন দ্রুত সরে আসে। এক সাথে অনেক প্রশ্ন তার মাথায় কিলবিল করে। বীণা কি আজও আমাকে ভালোবাসে? ও কি সত্যি আমার ছায়ায় ছায়ায় থাকার জন্যই সুবীর মৈত্রের সবকিছু সূত্র ও উত্তরাধিকার হেলায় ছিন্ন করে এসেছে? ও কি সত্যি আমাকে চায়? ও অবলম্বন চায়, না আমাকে চায়? ওকে কি ক্ষমা করা সম্ভব? জীবনের বন্ধুর পথে চলতে গিয়ে ওর ওটা একটা সাময়িক স্খলন? ও কি জীবনের প্রথম প্রেমের মূল্য দিতেই গিয়েছিলো? প্রেম কি জীবনে একবারই আসে, না একাধিকবারও আসতে পারে? ওকে কি কাছে টানা সম্ভব? আবেগের ঝড় একদিন যাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, প্রকৃতির ঝড় আজ কেনই বা তাকে আমার শয্যাপ্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিল? একে আমি কোথায় রাখবো? জীবনের ইতিহাস থেকে—আমার জীবনালেখ্য থেকে—দুটি বছরকে কি ঘষে ঘষে মুছে ফেলা যায় না? অপরাধই কি জীবনের সব? ক্ষমা কি কিছুই নয়? সংসারের অনন্ত পাপরাশির আবর্তে তো আমরা নিরন্তর ঘুরপাক খাচ্ছি। বোবা জন্তুর মতো আমরা তো সবই মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছি। প্রতিবাদ আমরা কোথায় কতখানি করতে পারছি? জগতের অনন্ত জনসমুদ্রে বুদ্বুদ এই তুচ্ছ মেয়েটার একটা অপরাধ ক্ষমা করলে কতটাই বা ক্ষতি হতে পারে? প্রথম প্রেমের মূল্য যদি ও দিয়েই থাকে তবে কতখানি শাস্তি ওর প্রাপ্য? প্রথম প্রেমের মূল্য দিতে ও চলে গেলো। আর আমিতো পারলাম না ওকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে সংসার গুছোতে। সেখানে কি আমার সাথে ওর পার্থক্য আছে? ওর প্রথম ভালোবাসা সুবীরের সাথে। আর আমারটা ওরই সাথে। তা হ'লে এখন? এখন আমি কি করি? আমার কঠোরতাই কি শেষ এবং একমাত্র কর্তব্য? আর সব পথই কি চিরতরে রুদ্ধ? একদিন মন ছাড়া দেহ পেয়েছিলাম; ও মনছাড়া দেহ দিতে চায় নি। তাই পালিয়ে বেঁচেছিলো। আজ বীণা মন নিয়ে এসেছে, দেহ দিতে পারছে না। আজন্মালালিত সংস্কারকে ধুয়ে মুছে ফেলতে ও পারছে না। আমিই বা পারছি কই? এ কী বিষম যন্ত্রণা!

সৌমেন আবার সিগারেট ধরায়। পায়চারি করে। এবার মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করতে থাকে। একটা ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বীণার মুখখানাকে আরও সুন্দর দেখায়। সৌমেনের মনে হয়, সে যেন ছুটছে, প্রাণপণে ছুটছে। দু'হাত বাড়িয়ে বীণার দিকে ছুটছে। কিন্তু কিছুতে এগুতে পাচ্ছে না। পা' ভেঙ্গে আসছে। সে যেন পড়ে যাচ্ছে। তার আরও মনে হয়, তার আশেপাশে আরও অনেকে তারই মতন ঈপ্সিত জনের জন্য ছুটছে। কিন্তু পৌঁছাতে পারছে না। তার মাথা ঘোরে কুমোরের চাকের মতো। মনে হয়, বীণা ওখানে নেই। সৌমেন একটা কী হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই দেখে ওরা দু'জনে দু'টো ভীষণাকৃতি সরীসৃপ হয়ে আদিম যুগের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। একটা সরীসৃপ আর একটাকে যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চাইছে; কিন্তু পারছে না। দুটো সরীসৃপের মাঝখানে কি যেন একটা বড় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ডিঙোতে চেষ্টা কচ্ছে উভয়েই। কিন্তু পারছে না! দু'দিকে দুটোই ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে। কাছে আসতে পাচ্ছে না।

... ...

সকালে ঘুম ভাঙলে সৌমেন দেখলো যে, সে চেয়ারে বসে খাটের পায়ার ওপর দুটো হাত রেখে তার ওপর মাথাটা এলিয়ে ঘুমোচ্ছিলো। তার সারা দেহ খুব ক্লান্ত। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে। মনোরম সূর্যোদয় হয়েছে নতুন প্রভাতে। জানলার ছিদ্র পথে ক্ষীণ একটু সূর্যরশ্মি বিছানায় এসে পড়েছে। বিছানায় বীণা ঘুমুচ্ছে। তার মুখে কোন ক্লান্তি, গ্লানিমা বা বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই।

—ঃঃ—

অমায়িক

এম. এ. প্রথম পর্বে ভর্তি হয়েই যে চার পাঁচ জনের সাথে দু'চার দিনের মধ্যেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম তাদের মধ্যে সত্যেন ছিল নিঃসন্দেহে অন্যতম। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি বিনয়ী ব্যবহার! উজ্জ্বল ফর্সা রং, মাথায় কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল, প্রশস্ত ললাট। চটপটে হলেও একটি প্রশান্তভাব তাকে ঘিরে থাকতো। লেখাপড়াটা বেশ ভালভাবেই করেছিল। কোথাও ফাঁকফোকড় ছিল না। বিশেষ করে সাহিত্যেই তার ব্যুৎপত্তিটা ছিল বেশী। আমরা বাংলা বিভাগের ছাত্র হলেও ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যেও তার যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। আচারে-আচরণে, কথায়-বার্তায়, বিপদে-আপদে সহানুভূতি প্রকাশে সত্যেন সত্যই ছিল অদ্বিতীয়। তাই তার মধ্যে একজন উত্তম বন্ধুর সন্ধান পেয়ে ধন্য মেনেছিলাম।

ক্লাসে পাশাপাশি বসতাম। অবসর সময়ে রমনা পার্ক, রেসকোর্স ময়দান, বুড়ীগঙ্গার তীরে দু'জনে একত্রে ঘুরতাম। সিনেমা দেখলে কখনো একলা যেতাম না। দু'জনেই থাকতাম জগন্নাথ হলে, তবে একরুমে থাকা সম্ভব হয়নি।

কখনো কখনো বিকেলে জগন্নাথ হলের মাঠের প্রান্তে পুরু দূর্বার গালিচায় বসে যেতাম সত্যেন, মোহিত, নিরুপম, অতনু ও আমি। কতো গল্প হতো। অতীত-স্মৃতি রোমন্থন থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে আমরা রাজা মহারাজা হয়ে যে কি করবো তা-ও গল্পের বিষয়বস্তু হতো।

সত্যেন প্রায়ই তাদের অতীত দিনের জৌলুসের কথা তুলতো। তার বাবা ছিলেন নামজাদা জমিদার। জমিদারি গেছে বটে; কিন্তু আজও আট দশ মাইলের মধ্যে জনার্দন ভট্‌চাজের নাম বল্লে চেনে না এমন লোক নেই। প্রসঙ্গত উঠত তাদের বাড়ীর কথা। বাড়ীতে আজও

দোতালা দালান, তবে দারুণ পুরানো হয়ে গেছে। সামনে ফুলের বাগান। তারপরেই বাঁধান পথের একপাশে একটা অশোক গাছ, আর অন্যপাশে একটা বকুল গাছ। মোহিত মাঝখানে ফস করে বলতো—ইস্। একেবারে অলকাপুরীর বর্ণনা দেখছি। আর একটু এগুলেইতো বড় দীঘিটা।

সত্যেন বল্লে, নারে, দীঘি নেই, আছে একটা পুকুর। তবে তাতে ঘাটলাটা ভেঙে গেছে। আর এখন সেখানে পদ্মও ফোটে না, রাজ হাঁসও চরে না।

নিরুপম বললে—আরে, একদিন তো ওসব ছিল। আজকে না হয় থাকলোই না। বর্তমানের চেয়ে ইতিহাস, সুখের চেয়ে স্মৃতিই তো মূল্যবান। তা জমিদার-নন্দন এখানে ঢাকায় না পড়ে লণ্ডন গেলে না কেন হে? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সত্যেন চোখ বুজলো যেন অনেক স্মৃতির মধ্যে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারপরে মৃদু হেসে বল্লে—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেইরে। এখন শুধু একটা দোতালা ভাঙা দালান ও জমিদারের নামটুকু ছাড়া কিছু নেই। এখন আমরা দরিদ্র। তবে বাবার মেজাজটা আগের মতনই আছে।

এমনি করে সত্যেনের অনেক কথাই জেনেছিলাম। তার লেখাপড়া প্রধানত বাবার কাছ থেকেই হয়েছে। বাবা কোন পাশ না করলেও অনেক পড়াশুনা করেছেন। মা-ও গুণবতী। মা-বাবার মিলিত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিকতায়ই সত্যেন শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত।

এর ফলে কি হলো? আমরা সবাই সত্যেনকে একটু সমীহ করে চলতাম। আহা! এককালে তো জমিদার-নন্দনই ছিলো। আজ না হয় জমিদারি গেছেই। রেস্তোরাঁয় খেতে বসে আমরাই প্রায় পয়সা দিয়ে দিতাম। সত্যেন দিতে চাইলেও দিতে দিতাম না। ওর ব্যবহারের মাধুর্য ও পারিবারিক ঐতিহ্য আমাদের একেবারে মুগ্ধ করেছিল।

মাঝে মাঝে আমরা সাহিত্য সমালোচনায় বসতাম। সত্যেন ছিল Art for Art's sake নীতিতে বিশ্বাসী। তাছাড়া art শব্দটাও একটু বেশী প্রয়োগ করতো। সাহিত্যের art, চিত্রবিদ্যার art, মৃৎশিল্পের

art, রাজনীতির art থেকে শুরু করে fine art এমন কি প্রণয় সৃষ্টির art পর্যন্ত বিস্তৃত হতো আমাদের আলোচনা। আমরা সবাই সব কথায় তার সাথে একমত হতে পারতাম না। তবে তাতে ওর খুব একটা কিছু যেতো আসতো না। খুব বিনয়ের সঙ্গেই ও অন্যের মতের তুলনায় স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার সযত্ন চেষ্টা করতো।

সত্যি কথা বলতে কি, সত্যেনের সবই আমার ভালো লাগতো, কেবল art শব্দটার মাত্রাধিক ব্যবহার আমাকে কেন যেন পীড়া দিতো। দু'একদিন ওকে কথাটা বলব বলব করেও আর বলা হয়নি।

দেখতে দেখতে দু'টি বছর কেটে গেল। পরীক্ষাপর্ব শেষ করে চোখের জলের ভেতর দিয়ে জগন্নাথ হল থেকে যে যার বাড়ী চলে গেলাম। অনেক কিছু ভুলে গেলেও সত্যেনের স্মৃতি সত্য হয়েই রইল আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে।

....

কোথা দিয়ে কেমন করে বছর দশেক কেটে গেল। এক বন্ধুর বিয়েতে ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে যেতে হলো। বিয়ের পরদিন সবাইকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমি সহস্রাইল স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটেই চল্লাম সত্যেন-দের বাড়ীর দিকে। বলা বাহুল্য, পা ছাড়া অন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা সেখানে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে থাকে না। ঠিকানাটা আমি জানতাম। ঘণ্টা দুই হাঁটতেই এলো ঝেঁপে বিষ্টি। ঘণ্টা খানেক প্রবল বর্ষণের শেষে বিষ্টি থামল বটে; কিন্তু দিয়ে গেল সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার। কখনো মাঠ, কখনো মানুষের বাড়ী, কখনো ছাড়া ভিটে পার হয়ে এগিয়ে চল্লাম। স্যাণ্ডেল হাতেই নিয়েছিলাম। তবু জামাকাপড় শুধু ভিজেই যায়নি, অনেক জায়গায় কাদাও লেগেছে। রাত আটটার দিকে সত্যেনদের গ্রামে প্রবেশ করলাম। একটা বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখি পাটখড়ি দিয়ে বাড়ীর চারদিকে প্রাচীর রচনা করা হয়েছে। অনেক ডাকাডাকি করার পর এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক এলেন।

—জমিদার জনার্দন ভট্‌চাজের বাড়ী কোন্ পথে যাব, চাচা?

—জমিদার !

—হ্যাঁ। জমিদার জনার্দন ভট্‌চাজ।

—আমাদের এ তল্লাটেতে কোন জমিদার নেই, কোন কালে ছিলও না।

—ছিলও না ? বলেন কি চাচা ?

—ঠিকই কইছি। ছিলও না।

—তবে জনার্দন ভট্‌চাজ বলে কেউ ?

—হ্যাঁ ! জনার্দন ঠাকুর বলে এক বাওন আছে।

—তার বাড়ীটা কোন পথে যাব ?

—আপনে সোজা যান। এই সরু রাস্তাটা যেখানে মোড় খাবে সেখানে এট্টা বাড়ী পাবেন। সে বাড়ীতে জিগাইলেই কইয়া দেবে। চাচাজানকে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে চল্লাম। বুনোপথ। গাছের ডাল থেকে ঝপ ঝপ করে জল ঝরে পড়ছে। অন্ধকারে কিছুই দেখছিনা। নিতান্তই মনের জোরে চলছি, চোখের জোরে নয়। রাস্তার মোড়ে সত্যিই একটা বাড়ী পেলাম। দূর থেকে একটা আলোও বাড়ীর মধ্যে দেখলাম। দু'তিনটা ডাক দিতেই এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ধুতি উঠিয়ে পরে, নগ্ন দেহে, হাতে একটা হ্যারিকেন ও একটা ছাতা নিয়ে বাড়ীর সামনে এলে আমি আমার অভিপ্রায় জানালাম। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে বলেন—

আপনাকে একেবারে দিয়াই আইসি। তিনি আগে আগে, আমি পাছে পাছে চল্লাম। চারদিকে কী বিশ্রী ও বেপরোয়া জঙ্গল। চারদিকে বাঁশঝাড়। দারুণ নির্জন। কেমন গা ছন্‌ছন্‌ করে উঠলো। এতো ভূতুড়ে জঙ্গল যে এ নিয়ে কবিতা লেখাও সম্ভব নয়। সত্যেনকে বাড়ী পাবতো, দাদা ?

—হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! যাবে আর কোথায় ?

এক সময় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখলাম, ঝিকাগাছের ডাল দিয়ে বেড়া দেওয়া একটি বাড়ী। একটা গেটও আছে। ওখানে দাঁড়িয়েই উনি হাঁক দিলেন—সতু ! ও সতু ! তোগো বাড়ীর অতিথ। নিয়া যা।

একটু পরেই একটা টর্চের আলো পড়লো। আলোটা এগিয়ে আসছে। আমার বুকের ভেতরটা কেমন তোলপাড় করছিল। ইস্! সত্যেনকে কতোদিন দেখিনি!

—ও! তুই! আয় সমীর। তুই একদিন আসবি, জানতাম।

পথ প্রদর্শক ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলাম।

... ...

তিনদিন সত্যেনদের বাড়ীতে ভালোই কাটলো। তাদের খড়ের ছাউনি দেওয়া, গাছের খুঁটি ও তক্তার বেড়ার ঘর। সামনে একটি ছোট্ট বারান্দা। বারান্দার একপাশে আবার একটি খোপ। ওখানেই সত্যেন থাকে। আমিও সেই সাথেই থাকার সুযোগ পেলাম। বাড়ীতে সর্বত্র শুধু আম আর কাঁঠালের গাছ। দিনেও বড় একটা রোদ পড়ে না। ওর মা-বাবা সত্যি ভাল মানুষ। ওদের ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সত্যেন হাই স্কুলে মাষ্টারী করে, আড্ডা দেয়, গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন দেখে, বিয়ে কিছুতেই করতে চায় না······ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিন তিনটি দিন আমার ওখানে কেটে গেলো। গ্রামের মানুষজনের সাথে একেবারে প্রাণে প্রাণে মিলে গেলাম। মানুষগুলো ভারী সরল সহজ। ক্রমে একটু একটু করে জেনে ফেল্লাম যে, সত্যেনদের কোন-কালে জমিদারি, দালান-কোঠা, কিছুই ছিল না। সামান্য জমিজমা ছিল। তাও ওর পড়াশুনার সুবাদে বিক্রি করতে হয়েছে। ওর বাবা নিতান্তই পূজারী বামুন। তবে ওদের গ্রামের সবাই ভালবাসে। আমাকে দেখে সত্যেন সামান্য একটু বিচলিত হয়েছিল মাত্র। আমিও আর প্রসঙ্গটা আদৌ তুলিনি। সবই ওর আগের মতনই আছে। এমনকি art শব্দটির বহুল প্রয়োগও আজ পর্যন্ত বর্জন করতে পারেনি।

চতুর্থ রজনীতে ঠিক হল যে, ভোরের দিকে আমি রওনা হবো। সত্যেন আমাকে সহ-স্রাইল স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে পৌঁছে দিয়ে যাবে। শুনে আমি খুশী হলাম।

সত্যেনদের বারান্দায় একটি নড়বড়ে বেঞ্চি ছিল। ঐখানে এ ক'দিন

বসেছি। বসে বসে দেখেছি, তক্তার রেড়ার ওপর সবুজ রং দিয়ে সুন্দর করে লেখা রয়েছে Art is for art's sake.

রাত্তিরে খুব ভাল ঘুম হল না। বারবারই ইচ্ছে হচ্ছিল; সত্যেনকে কিছু শুনিয়ে যাই। জমিদার-নন্দন চিরদিন এমনি করে art করেই গেল। কিন্তু কেন যেন পারলাম না। রাত তিনটের দিকে ওকে ডাকলাম। বেরিয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে। ও ধড়ফড় করে উঠেই প্রাতঃক্রিয়ার জন্য বাইরে গেল। আমিও আমার ব্যাগ গুছাতে গিয়ে ব্যাগের মধ্যে একখণ্ড চক রয়ে গেছে দেখতে পেলাম। কি দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এলো! অমনি বারান্দার খোলা অংশটায় এসে সবুজ রঙের লেখাটার নীচে বড় বড় অক্ষরে খুব স্পষ্ট করেই চক দিয়ে লিখলাম।

To tell a lie is the best art.

গরল

(এক)

কালীপূজো এসে গেছে। কুমোর পাড়ায় বাড়ী বাড়ী কালী প্রতিমায় রং করা শুরু হয়েছে। এমন দিনে সকাল বিকেল সঙ্গীদের নিয়ে কালী দেখাটাই আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূজোর ছুটি, বইপত্রে ধুলো জমে গেছে। পূজো, লক্ষ্মী-পূজো হয়ে গেছে, এবার কালী পূজো। ভাই-ফোঁটার পরেই স্কুল খুলবে, তখনই বই-পত্র খুলে স্কুলে মাষ্টারদের হাত থেকে কোন রকমে পিঠ বাঁচানোর ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু সুন্দর সুন্দর কালী—প্রতিমাগুলো যদি না দেখে রাখি, তাহলে তো আর দেখার সুযোগই আসবে না। সনাতন, কার্তিক, যোগেশ, লক্ষ্মী—এরা সবাই কালী গড়িয়েছে। গ্রামের একটা বড় পাড়া জুড়েই কুমোরদের বাস। প্রত্যেক বাড়িতেই উঠান, বারান্দা, ঘরের মধ্যে, এমন কি পুকুরের ঘাটে যাবার

পথেও কালী, ছোট, বড়, মাঝারি, নানা মাপের প্রতিমা। কোনখানার ডান পা আগে, কোনখানার বা পা আগে। কেউ বা ঘন কৃষ্ণা, কেউ বা শ্যামা। কোনখানার মুণ্ডু লাগান হয়ে গেছে, কোনখানার বা এখনও হয়নি। একটা অভূতপূর্ব আনন্দ, একটা দারুণ উত্তেজনা নিয়ে সকাল বিকেল এবাড়ী-ওবাড়ী করি। সেদিন সনাতনের বাড়ী থেকে মাথা-প্রমান সুন্দর কালীখানা দেখে লক্ষ্মীর বাড়ীর দিকে ফিরছিলাম। হঠাৎ পথের পাশে একটা বাড়ীর উঠানে দেখলাম, বেশ কিছু লোক জমে গেছে। আমরা সদলবলে ঢুকে পড়লাম ভিড়ের মধ্যে।

দেখলাম, সাপখেলা হচ্ছে। একটা বড় খড়িশ সাপ, সঙ্গে বার-চোদ্দটা ছোট্ট বাচ্চা। সে এক ভয়ংকর-সুন্দর দৃশ্য। গতরাতে কর্মকার পাড়ার এক বাড়ীর রান্না ঘরের ভিত থেকে কাচ্চা-বাচ্চা সহ এ সাপটাকে ধরে আনা হয়েছে। সাপটা দারুণ হিংস্র। ওটা ভীষণভাবে ফণা তুলে দাঁড়ায়। সাপুড়ে হাঁড়িটা দোলাতেই ছোবল মারে, টক করে শব্দ হয়। বাচ্চাগুলো প্রায় লেজের ওপরে দাঁড়ায়, লাফ দিয়ে ছোবল মারে, সবেমাত্র বন্দী হয়েছে, কাজেই সাপগুলো তাদের বন্য স্বভাব একটুও বদলাতে পারেনি।

ইস্! যার একটা ছোবলই একটি প্রাণ-বিনাশের পক্ষে যথেষ্ট, সে এত কাছে থেকে এমন আস্ফালন করছে। এদের নিয়ে খেলা হচ্ছে? এযে যম নিয়ে খেলা।

আস্তে আস্তে ভীড় কমতে থাকে। সাপুড়েও সাপগুলোকে হাঁড়ির মধ্যে ভরে ফেলে। মুখে একটা সরা দিয়ে ঢেকে কাপড় জড়িয়ে বেঁধে ফেলে। এবং তারপর হাড়িটাকে বারান্দায় মাঁচার তলায় রাখে। আমি তখনও স্বপ্নাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। কখন যে সবাই চলে গেছে, তা আমার খেয়ালই নেই। সাপুড়ে বেরিয়ে এসে আমাকে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে—

—তোমাগো তো বড় বাড়ী?

—হুঁ! তুমি আমাকে চেনো?

—না! চিনি না?

—তুমি না ছোট বাবুর ছাওয়াল ?

—হুঁ।

—তোমার নাম তো দীপু ?

—হুঁ! আমি দীপক চক্রবর্তী।

—কেমন ছ্যাখলা চক্কোত্তি ?

—আমার ভয় করছিল ; আবার ভালোও লাগছিল।

—ভয় কিসের ? কিছু ভয় নাই।

—তুমি যে সাপ ধরো, তোমাকে কামড়ায় না ?

—কামড়াবে ক্যান ? আমার কাছে গাছড়া আছে যে।

—গাছড়া! বাবা যে বলেছেন, গাছড়া-টাছড়া সব মিথ্যে কথা।

—তোমার বাবা জানেন না। এতো মা মনসার গাছড়া ? এ কি আর মিথ্যা হয় ? আমার স্বপ্নে পাওয়া গাছড়া।

—স্বপ্নে পাওয়া !

—হ। একদিন রাত্তিরে স্বপ্নে দেখলাম, মা মনসা আমার শিয়রে বইস্যা কইতাছেন, ছ্যাখ্ গনেশ, অমুক গাছের শিকড় সঙ্গে রাখবি। তাইলে কোন সাপ তোরে কামড়াতি পারবে না। স্বপন দেইখ্যা কাঁপতি লাগলাম। মায়ের আমার কী রূপ! মা যে আমারে হাতে হাতে গাছড়া দিয়া গ্যাল। সেই থিকা আর সাপে আমারে কমড়াতি পারে না।

—তুমি প্রায়ই, সাপ ধর ?

—কি করি, কও ভাইর ব্যাটা ? আইস্যা ডাকে, কান্নাকাটি করে, যাই, ধইর‍্যা আনি।

—তোমার এসব ভালো লাগে ?

—আগে ভালো লাগতো না। এ্যাহন গা-সওয়া হইয়া গ্যাছে।

—তুমি কী সাপ ধরো ?

—সে অনেক। খড়িশটাই আমাগো ছ্যাশে বেশী। তাছাড়া জাত্তি, পাতরাজ, দুধয়াজ, কালীনাগ, শঙ্খচূড়—এইসবও ধরি।

কথায় কথায় বেলা শেষ হয়ে এলো। কেমন যেন ভালো লেগে গেল গনেশ সাপুড়েকে। বললাম, কাকু, আমার সাপের গল্প খুব ভালো লাগে।

—বেশ বেশ! আমার জীবনেই তো কত সাপের গল্প আছে। আসবা, গল্প কবো। এইতো সেবার, ভূবন ধোপার ঘরে সাপ ধরতে গ্যালাম। আমি তো দুই হাতে দুইডা খড়িশ ধরছি। এট্টার ল্যাজ পাও দিয়া চাইপ্যা ধরছি। কিন্তু অন্যডা আমার হাতে দিল প্যাঁচ। সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে যারা ছিল, তারা দিল দৌড়। আমার তো জীবন যায়। শ্যাষ পর্যন্ত একজন অবশ্য সাহস কইর‍্যা আইল।

ছবিটা আমার মনের চক্ষে ভেসে উঠতেই গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। সর্বনাশ! কী ভয়ংকর ব্যাপার!

—এইতো সেবার, তোমার হয়তো তখন জন্মই হয় নাই ভাইর ব্যাটা, তোমাগো দুগ্‌গা মণ্ডপ থিকা দুইডা বড় সাপ ধইর‍্যা আনলাম না। এট্টা খড়িশ, আর এট্টা দাড়াশ। সারাটা মণ্ডপ খোস্তা দিয়া চাইল্যা ফেল্লাম। শ্যাষকালে পাইলাম গিয়া একেবারে কাঠামের তলায়।

বেলা একেবারে গড়িয়ে আসে। দেখে বাড়ীর দিকে পা বাড়াতে হলো। কিন্তু এই অল্প সময়েব মধ্যেই গণেশ কাকার সাথে আমার কেমন একটা সখ্য গড়ে উঠ্‌লো।

(দুই)

মাস দু'এক পরের কথা। কুল পাকতে শুরু করেছে। এগাছ সেগাছ করে কুল খেতে খেতে গণেশ কাকার বাড়ী গিয়ে উঠে পড়লাম। দেখ্‌লাম, একটা বড় খড়িশ সাপকে একটা মাছ খাইয়ে একটা দঁড়ি দিয়ে মুখ বেঁধে মাটিতে ফেলে রেখেছে। সাপটা অস্বস্তিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর অন্য একটা সাপকে গলাটা বা' হাত দিয়ে চেপে হাঁ করিয়ে একটা চ্যাং মাছ কাঠি দিয়ে মুখের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

আমার কাছে এ দৃশ্য সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব বলে মনে হল। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলাম। বেশ কষ্ট করেই মাছটাকে মুখে ঢোকাতে হল। তারপর দঁড়ি দিয়ে এটারও মুখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হল। এটাও অস্বস্তিতে গড়াতে লাগলো। কাজ শেষ হলে গণেশ কাকা বললে, কি দ্যাখছো, ভাইর ব্যাটা?

—না, সাপকে এমন করে খাওয়ানো হয়, তা জানতাম না। গণেশ কাকা একটু হাসল। বললে—ওরা যখন বনে-জংগলে থাকে, তখন ইচ্ছামতো শিকার ধরে। মাছ, ব্যাঙ, পোকা, মাকড়, ত্যালাপোকাই ওদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু ধইর‍্যা আনলে ওরা আর কিছু খায় না। তুমি দশটা ব্যাঙ হাঁড়ির মধ্যে দ্যাও না ক্যান, ওরা খাবেনা। না খাইয়া মরবে, তবু খাবেনা। তাই মুহের মধ্যে ভইর‍্যা দিতে হয়।

—অদ্ভুত তো!

আমি বললাম, কাকু! আমাকে একটু জল দেবে, খাবো। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গণেশ আমার দিকে তাকাল, সে যেন আমার কথাটা বুঝতেই পারলো না। আমি বললাম, পিপাসা পেয়েছে কাকু, জল খাবো।

এবার একটু কাছে এগিয়ে এসে সে বললো—

—তুমি না চক্কোত্তি বাড়ীর ছাওয়াল? আমাগো বাড়ীতে জল খাবা!

আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে। আমার খুব পিপাসা পেয়েছে। এক গ্লাস জল দাওনা।

—ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়?

—তাতে কি হবে?

—তাতে কি হবে! তোমরা তো ভদ্দর লোক। আমরা যে ছোট জাত।

আমি চুপ করে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলাম। গণেশ কাকার শেষের কথার মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা লুকানো ছিল। প্রথমটায় কেন যেন কিছু বলতে পারলাম না। কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা বোধ করছিলাম। তখন দশ ছাড়িয়ে এগারতে পা দিয়েছি। জাত-ফাতের কথা ভালো করে বুঝি না। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের অবহেলা দেখলে মন খারাপ হয়। তাই গণেশ কাকার সাথে সেদিন যে-সখ্যটা আমার গড়ে উঠেছিল আজকে তার সাথে আমার কোথায় যেন একটা ব্যবধান ধরা পড়লো। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগলো না। গণেশ

কাকা বললে, বেলা গেছে। আমার এখনও নাওয়া হয় নাই, খাওয়াও না। তুমি ঐ স্কুল-বাড়ীর সামনে যাও। ঐখানকার কল থিকা জল খাইও। গণেশ কাকার এ প্রস্তাব ভালো, কিন্তু আমার মনে ধরলো না। আমি তার বারান্দায় উঠে নড়বড়ে বেঞ্চটার ওপর বসলাম। বললাম, আমাকে এক গ্লাস জল দাওনা, কাকু। ঘরের মধ্যে গিয়ে একটু পরে একটা পেতলের গ্লাসে করে এক গ্লাস জল এনে আমার হাতে দিল। জলটা আমি নিঃশেষে পান করে ফেললাম। গ্লাসটা হাতে নিয়ে গণেশ কাকা কিযেন ভাবলে।

—একথা জানাজানি হইলে ভাইর ব্যাটা, তোমারে বাড়ীতে বকাবকি করবে। আর আমার ভাগ্যে কি ঘটবে সে কথাতো বলাই শক্ত। তুমি এখন বাড়ী যাও।

—কাকু, তুমি যে সেদিন বলেছিলে সাপের গল্প করবে। আজ কর না।

—এখন কি গল্পের সময়? সময়মত আইলে গল্প করবো। অনেক গল্প।

—কাকু, শুনেছি, তুমি নাকি শুধু সাপই ধরনা, তুমি নাকি ভূতও ধর?

—সে, কি? ভূত আবার কেউ ধরে নাকি? ভূত তাড়াই, ভূত ধরি না। কত ভূতইতো জীবনে তাড়াইলাম।

—ভূত তোমার কোন ক্ষতি করে না?

—করবার চেষ্টা করে, পারে না। খালি সেবার গাছের ডাল কাটতে উঠছিলাম, তখন এট্টা ঠ্যালা দিয়া ফ্যালাইয়া দিল। এ সেই ভূতটা যে ভূতটারে আমি খগেন সাহার বড় মাইয়ার কাঁধ থিকা নামাইছিলাম।

—ভূতটাকে তুমি চিনলে কি করে?

—বা! একবার যারে দেখি, তারে কি আর ভুলি নাকি? এই যে দেখ, এতো মানুষ, একজনের সাথে কি আর একজনের চেহারায় মিল আছে? ভূতেরও ঠিক একই জিনিষ। কত রকমের যে ভূত আছে! কী ভীষণ যে তাগো চেহারা!

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ঠিক আছে। আর একদিন এসে সাপের গল্পও শুনবো, ভূতের গল্পও শুনবো।

—ঠিক আছে।

(তিন)

স্কুলে পড়াশুনোর চাপে ব্যস্ত ছিলাম। কতদিন হয় গণেশ কাকার কথা ভুলেই গেছি। আজ ছুটির দিন। ভাবলাম, একবার ওর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ পেরিয়ে এক সময় এসে সাপুড়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম। শীতকাল শেষ হয়ে এসেছে। বেলা বেড়েছে, তবু সাপুড়ে রোদে চুপ করে বসে আছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রথমটায় সে কোন কথাই বললো না। কেমন যেন একটু গম্ভীর মনে হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাকু, তোমার কি শরীর খারাপ? বলেই সে যে মাদুরটার পরে বসেছিল সেটার পাশে বসতে গেলাম. হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো, না না এখানে না। তুমি ভাইর ব্যাটা দূব্বার পরে বইস। তোমাগো বসার মতো আসন তো আমাগো বাড়ীতে থাকে না।

আমি দূর্বার পরেই বসে পড়লাম। বেশ কিছু সময় ওর সঙ্গে আমার কথা হল। জানতে পারলাম, সম্প্রতি আমার জ্যাঠামশাইয়ের সাথে সাপুড়ের দু'তিন দফা মন কষাকষি হয়ে গেছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আমার জ্যাঠামশাই শ্রীযুক্ত প্রতাপ চক্রবর্তী ছোট খাট একজন জমিদার। জমিদার খুব বড় না হলেও তাঁর আচার আচরণে ও দরিদ্র প্রজাদের প্রতি শাসনের ক্ষেত্রে পিতৃদত্ত নামটির তিনি পুরোপুরি মর্যাদা, রক্ষা করেই চলেন। পাঁচ-ছ পুরুষ পূর্বে আমাদের এক পূর্ব পুরুষ গণেশের এক পূর্ব পুরুষকে দূরবর্তী এক জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আমাদের গ্রামের প্রান্তে এনে ঠাঁই দিয়েছিলেন। এদের বসতভিটা এবং কয়েক বিঘা চাকরাণ জমিও দেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে এরা পুরুষানুক্রমে আমাদের বাড়ীতে বিপদাপদে, আনন্দ-উৎসবে,

কায়িক শ্রম দিয়ে যেত। খাজনা এদের বরাবরই মওকুফ করা হতো। তবে এদের বিপদের দিনেও জমিদাররা যে সাহায্য করত না তা নয়। কিন্তু দিনকাল দ্রুত বদলে যাচ্ছে। জমিদারী উচ্ছেদের জন্য তখন জোর আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। নেতারা মিটিং করে বলে বেড়াচ্ছেন, জমিদারকে খাজনা দেবেনা, ফসলের ভাগও দেবে না। এতে করে প্রজারা কিছুটা সাহস পেয়েছে, আবার এই গণেশটিও একটু সৌখিন প্রকৃতির। কাজেই জমিদার বাড়ীতে কায়িক শ্রম দানে এর খুব আপত্তি। এর ভাই কার্তিক অবশ্য ডাকলেই জমিদার বাড়ীতে হাজির হয়। কাজেই জমিদার সাপুড়ের উপর ক্ষ্যাপা হয়ে গেছেন। ক'দিন আগে আবার জ্যাঠা মশাইয়ের লোকেরা এর একটা ভালো কদম গাছ জোর করে কেটে নিয়ে গেছে। গণেশ গিয়েছিল বড় কর্তার কাছে নালিশ জানাতে। কিন্তু উল্টো সে দারুন শাসানি শুনে এসেছে।

—তোর খুব বাড় বেড়েছে, গণশা। গাছ কাটতে গেলে তুই আমার লোকদের অশ্লীল গাল দিয়েছিস।

—বড় কর্তা! আমার বাবার হাতের লাগানো গাছটা। আমার দারুন মায়া।

—কিন্তু ঐ গাছটা যে জায়গায়, সে জায়গাটাযে আমার বাবার।

—কিন্তু বড় কত্তা, ও জায়গা তো আপনারা আমাগো দিয়া দিছেন।

—দিয়ে দিছি ঠিকই। কিন্তু তোর মগজে কি কুলায় যে জমিদারকে কায়িক শ্রম না দিলে চাকরাণ জায়গার স্বত্ব হারাতে হয়?

—আমার দাদাতো ডাকলেই আইসে।

—তা তুমি আস না কেন নবাব পুত্তুর?

—আমি বড় কত্তা সাপ ধরি, ভূত তাড়াই, পোলা-মাইয়া গো কি কইর‍্যা বাচাঁবো, সেই চিন্তা নিয়াই থাকি। আপনারা ডাকলে ইচ্ছা থাকলেও কুলাইয়া উঠতে পারি না।

—না গণেশ, না। ব্যাপারটা তা নয়। তুই নাকি বলেছিস, জমিদারী উঠে গেছে। এখন আর রাজা প্রজা নাই। এখন নাকি সবাই সমান?

গণেশ চুপ করে থাকে। একথার কোন উত্তর দেয় না।

—বল, হারামজাদা, প্রতাপ চক্কোত্তি আর গণশা সাপুড়ে কি সমান ?

—না, আমি সে কথা কই নাই, বড় কত্তা।

—তুই বলেছিস। তবে সাবধান গণশা, জমিদারী কিন্তু এখনও ওঠেনি। আর প্রতাপ চক্কোত্তিও এখনও মরে নি।

আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। তাই গণেশ কাকার মুখ থেকে এসব শুনে তার প্রতি একটা কেমন অনির্বচনীয় সহানুভূতি জেগে উঠল আমার। কিন্তু মনে হল, গণেশ কাকা জ্যাঠা মশাইয়ের ওপর খুবই ক্ষুব্ধ। আরও মনে হ'ল, এখানেই বোধ হয় ব্যাপারটার শেষ হবে না।

এরপর থেকে প্রায়ই সাপুড়ের কাছে যাই, গল্প শুনি। কখনও গল্প-গুলোকে রূপকথার চেয়েও অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবুও ওর প্রকাশভঙ্গি ও উপস্থাপনা গুণে নিতান্ত কাল্পনিক জিনিসও অতিবাস্তব হয়ে দেখা দেয়। যতই দিন যায়, আমার সাথে ওর ঘনিষ্ঠতা ততই বাড়ে। ইতিমধ্যেই ভূত তাড়ানোর মন্ত্র, সাপ ধরার গাছড়া ইত্যাদি পাওয়ার মোটামুটি আশ্বাসও পেয়ে গেছি। তাছাড়া আমিও আজকাল বারান্দার দরজা বন্ধ করে সাপুড়ের বাড়ীতে কিঞ্চিৎ মুড়িটুড়ি খেয়ে থাকি। কাজেই জমিদারের প্রতি ওর যতই বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ ঘণীভূত হয়, জমিদারের ম্লেচ্ছ ভ্রাতুষ্পুত্রটির প্রতি ততই তার অন্তরের নিবিড় একটা সম্পর্ক দানা বেঁধে ওঠে। একদিন সে বলেই ফেললো, ভাইর ব্যাটা, তুমিতো দৈত্য কুলের পেল্লাদ। কথাটার গুরুত্ব ভালো করে উপলব্ধি করার বয়স তখনও আমার হয়নি। তবে আমাদেরকে দৈত্য কুলের সাথে তুলনা করায় কেমন যেন খারাপ লাগলো। যাইহোক দু' একদিন অতি গোপনে সে আমাকে কুলের আঁচার এবং পাকা পেয়ারাও খেতে দিয়েছে। ওর প্রতি কেন যে আমার মায়া, তাও ঠিক আমি বুঝে উঠতে পারতাম না।

সেদিন সকালে সবেমাত্র বইপত্র নিয়ে মাদুর পেতে উঠানে পড়তে বসেছি। জ্যৈষ্ঠমাস। স্কুলে গরমের ছুটি। উঠানের বড় টগর গাছটার তলায় বসে ইতিহাস পড়ছি। হঠাৎ বহির্বাটিতে কেমন যেন একটা সম্মিলিত মানুষের কলগুঞ্জন শুনেই উঠতে যাচ্ছি; অমনি পেছন থেকে মা ডাকলেন—

—কিরে দীপু ? বসেই যে বই পত্র রেখে উঠলি ? কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

—মণ্ডপে। সোরগোল কিসের দেখবো। মাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমি এক দৌড়ে মণ্ডপে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, সেখানে বিশ-পঁচিশ জন লোক জমে গেছেন। জ্যাঠামশাই মণ্ডপের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসা। ইতস্তত: বেঞ্চগুলোতে আরও ছোটখাট জমিদাররা বসে আছেন। সবার চোখে মুখে একটা দারুণ উত্তেজনা। গণেশ সাপুড়ে একখণ্ড ময়লা কাপড় পরা। দেহের বাকী অংশ তার নগ্ন। মাথা নিচু করে বসা। একটা গরুর দঁড়ি দিয়ে হাত দুটো তার পিছন দিকে বাঁধা। উত্তেজিত মুখে জ্যাঠা মশাই তাকে বারবার প্রশ্ন করছেন—

—বল্, তোর কী মজুরী চাই ?

—প্রতিপক্ষ একেবারেই নিরুত্তর। কেযেন একজন বললেন, এসব শায়েস্তা করতে না পারলে শান্তিতে জমিদারী করা যাবে না। তার কথারই প্রতিধ্বনি করে আর একজন বললেন, সোজাকরে দিতে হবে।

আবার জ্যাঠামশাইয়ের ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বর—আজ তিনদিন আমার ঘরে সাপ ঢুকেছ। খোসাটা গর্তের মুখেই রেখে সাপটা গর্তে গেছে, এখনও বের হয়নি। তোমরা বলতো, সেই ঘরে কি করে থাকি ছেলে মেয়ে নিয়ে ?

চাণক্য পণ্ডিততো বলেই গেছেন—

'সসর্পেচ গৃহে বাস মৃত্যুরেব ণ সংশয়।'

আর নবার পুত্তুরের কাছে অন্তত: বিশবার আমার লোক গেছে। উনি এখন না তখন, সকালে না বিকালে, বলে বলে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। কালকে সন্ধ্যায়ও বলেছে, আজকে সকালে আসবেই। তাই ভোরেই আবার আমি লোক পাঠিয়েছি। নবাব তার মুখের পর বলে কি জানো ?

দিনকাল পালটে গ্যাছে। আমি সাপ ধরলে আমার ধরার

মজুরি দিতে হবে। তা নবাবের ব্যাটা, এমন কওছি, আমাদের জমি, আমাদের ভিটা, এই যে ভোগ কর, খাজনা কি একটা পয়সাও ছোঁয়াও ?

প্রতিপক্ষ একেবারেই নিশ্চুপ।

জানোয়ার, জবাব দে।

হঠাৎ উত্তেজনার বশে জ্যাঠামশাই উঠে দাঁড়ান। সাপুড়ের কাছে ছুটে গিয়ে পায়ের একখানা খড়ম খুলে জাগায়—বেজাগায় বিশ পঁচিশ ঘা বসিয়ে দেন। সাপুড়ে কাত হয়ে পড়ে যায়। কাটা পাঁঠাটার মতোই সে ছটফট করতে থাকে। চারদিক থেকে প্রায় সবাই জ্যাঠামশাইকে উৎসাহ দিতে থাকেন। গণেশ কাকার এ অবস্থা দেখে আমি কেঁদে ফেলি. একজন এগিয়ে এসে আমাকে বলেন, যাও, এখানে থাকতে নেই। এসব জমিদারী-ব্যাপার। বাচ্চারা এর মধ্যে আসবে না। আমাকে এক রকম জোর করেই বের করে দেওয়া হল।

চার

বেলা পড়ে এসেছে। আজকের দিনটা আমার ভালোভাবে কাটছে না। তাই আস্তে আস্তে বাড়ীর পিছনের বড় দীঘিটার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্যদিন এখানে দাঁড়ালে কেমন যেন খুশি খুশি লাগে। কিন্তু আজকে কিছুই ভালো লাগছে না। ওখান থেকে গুটি গুটি পা ফেলে ঘুরে ঘুরে কখন যে এসে গণেশ কাকার উঠানে পৌঁছে গেলাম, তা ঠিক খেয়ালই ছিল না। উঠানে পা দিয়েই দেখি গণেশ কাকার বউ একটা খুঁটি হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। ছোট দুটি ছেলে ধূলোবালি মেখে উঠানে কি খেলছে। সারা বাড়ীতে একটা দারুণ নিস্তব্ধতা। উঠানের একপাশে দূর্বার উপরে হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়ে গণেশ কাকা বসা ঘণ্টা খানেক আগে সে ছাড়া পেয়েছে। তাকে নাকে খত দিয়ে, ভবিষ্যতে কোন দিন এতবড় ধৃষ্টতা দেখাবে না বলে অঙ্গীকার করে আসতে হয়েছে। আমার আগমন সে টের পেয়েছে কিনা জানিনা। তবে মাথা তুলে

আমাকে দেখেই বললো, বসো ভাইর ব্যাটা। আমার বসার মতো উদ্যম বা ইচ্ছে কোনটাই ছিল না। আমি যেমন এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তেমনই দাঁড়িয়ে থাকলাম। বুঝতে বাকী ছিল না যে, আজ এ বাড়ীতে উনুন জ্বলেনি, ভাতও হয়নি। সাপুড়ে আস্তে আস্তে উঠে দিন তিনেক আগে যে নতুন গোখরো সাপটা ধরে এনেছে মাঁচার তলা থেকে সেই সাপের হাঁড়িটা এনে উঠানে বসল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, বেলা চইল্যা গ্যাল। এডারে আইজ আর কিছু খায়ানো হইল না। একটা ছেলেকে লক্ষ্য করে বলল, রূপা, মাছের হাঁড়িটাথ্যা এট্টা চ্যাং দে, সাপটারে খাওয়াই।

উলঙ্গ ছেলে দুটোর একজন ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে এক জ্যান্ত চ্যাং মাছ এনে বাপের পায়ের কাছে রাখলো। রোদ পড়ে এসেছে। দিবা শেষের সূর্যালোক সাপুড়ের পিঠে পড়ায় দেখতে পেলাম জ্যাঠামশাইয়ের খড়মের আঘাতগুলো চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠেছে। আমার বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠলো। সাপুড়ে সাপের হাঁড়ির মুখের কাপড় ও সরাটা সরাতেই সাপটা হাঁড়ির উপরে ফণা তুলে ঘনঘন জিব বের করতে লাগলো। সাপুড়ে হাতের সরাটা দিয়ে ওর মাথায় মৃদু আঘাত করতেই ও মাথা একটু নামিয়ে নিয়ে পরক্ষণেই হিংস্র ভাবে সরাটার পরে ছোবল মারছিল।

—তুমি তখন হাউ মাউ কইর‍্যা কাইন্দ্যা দিলা, ভাইর ব্যাটা ?

তুমি কেন ওখানে গ্যালা ? আমরা ছোটলোক। এসব আমাগো সহ্য করতেই হবে। কিন্তু—

সাপুড়ে থেমে গেল। তার ঠোঁট দুটো বার দুই কেঁপে উঠলো। তার মুখে চোখে কেমন যেন একটা হিংস্রতা আমি লক্ষ্য করলাম। তার গায় মাথায় তখনও ধুলোবালি লেগে আছে। চোখ দিয়ে যে অনেক জল ঝরেছে তার দাগও গাল থেকে মুছে যায়নি। হঠাৎ মনে হ'ল তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো। সূর্যের আলোর দিকে সে মুখ ফিরালে দেখলাম, চোখের কোণে দু' এক বিন্দু অশ্রু ঈষৎ ম্লান স্ফুলিঙ্গের মতো। আমি যেন ও-মুখের দিকে আর তাকাতে পারছিলাম না, পায়ের আঙ্গুল

দিয়ে মাটি খুঁড়েই যাচ্ছিলাম। আর একবার সাপটা জোরে সরাটার পরে ছোবল মারতেই ওর মাথায় সজোরে একটা আঘাত করে সাপুড়ে। আবার সরাটা সরিয়ে নিয়ে আসে। আবারও সাপটা তীব্র ফণা তুলে হাঁড়ির ওপর মাথা তুলে দাঁড়ায়। এবার তার লক্ষ্য যেন সাপুড়ের মুখখানা। গণেশ কাকার মুখখানা এবার আরও কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু ও-দিকে নজর না দিয়ে আমাকেই লক্ষ্য করে বলে—ভাইর ব্যাটা, তোমরা ভদ্দ্র লোক। আর আমরা? আমরা ছোট লোক। জীবন-ভর তোমাগো বাড়ীতে খাইট্যাও মল্লাম, মাইরও খাইলাম। আমরাতো আর মানুষ না! আমাগো সবই সইতে হবে। না সইয়াই বা কি করবো। যাবো কোথায়? এখান থিকা যদি যাই, তা-ও আর এক জমিদারের রাজত্বে যাতি হবে। সেখানেও তো এইরকমই হবে। তয় আমাগো কি আর উপায় নাই? কেম্বায় বাঁচি কওতো? আরতো সহ্য করা যায় না। বাপ দাদা যা সইয়া গেছে, আমারও তা সইতে হবে? আমার পরে আমার ছাওয়ালের ভাইগ্যেও তো এইয়াই জোটবে। শুনছি ভগমান আছে। সে নাকি অত্যাচারীর শত্তুর। কংসরে তো ভগমানই বধ কল্লো। এই কলিকালের কংসরা কি বধ হবে? একটু দম নেয় গণেশ। তারপর আবার বলে—না, কিসব বাজে বক্ত্যাছি। তুমি কী এসব ভালো শোনো? তোমারতো জ্যাঠা!

—আমি একেবারেই নীরব। কি বলবো? বলার আছেই বা কি?

আবার সাপটা বড় ফণাটা তুলে সাপুড়েকে ছোবল মারতে উদ্যত হলো।

গণেশ খপ করে বা হাত দিয়ে সাপটার গলাটা শক্ত করে টিপে ধরলো। সাপটা হাঁ করে পড়লো। দাঁতে দাঁত চেপে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গণেশ বল্লে—

আমার পরে তড়পাও ক্যান? আরে হালা গোখ্খুর, তোর ঐ ভীষণ কালকূটের একটুখানি যদি আমার থাকতো, তা হইলে এক রাইতের মধ্যে পেত্তাপ চক্কোত্তির গুষ্টি নিপাত্ত কইর‍্যা ছাড়তাম।

—::—

দুর্বোধ্য

নতুন জায়গার নাম শুনলেই আমি লাফিয়ে উঠি। এ যে একটা কি নেশা তা কাউকে বোঝাতে পারবো না। সেখানে গিয়ে নতুন নতুন সব কিছু দেখব, নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হবে, মানুষের কত বিচিত্র জীবনযাত্রার সাথে একাত্মতা ঘটবে! সেখানে যাতায়াতে কতটা ক্লেশ হবে, থাকা খাওয়ার কষ্ট হবে কিনা, এসব নিয়ে কোনদিনই মাথা ঘামাইনি। শুধু নতুনকে দেখার নেশায় বহু ক্লেশই অম্লান বদনে সহ্য করেছি! জেনেছি অনেক, এবং তা জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়েই আছে। নতুন কোন মানুষের সাথে পরিচয় হলেই মনের মধ্যে ঐ প্রবল আগ্রহের ভূতটা শুধু উৎপাত করতে থাকে, কি করে ওদের এলাকাটা শুধু একবার ঘুরে আসা যায় তার জন্য।

তখন মাষ্টারী করি এক হাইস্কুলে। জায়গাটা থানা হেড কোয়ার্টার হলেও একেবারেই অজ পাড়াগাঁ। সামান্য ক'জন অফিসার ও কিছু করণিকই প্রধানত আমার সঙ্গীসাথী। অবসর সময় ওদের সাথে আড্ডা মেরে ভালই লাগে।

তহশীলদারের অফিসে হঠাৎ একজন করণিক এলেন। নাম নন্দলাল সান্ন্যাল। আমাদেরই সমবয়সী। ভদ্রলোক খুবই মিশুক। খুব তাড়াতাড়িই একাত্ম হয়ে গেলাম। ওঁকে আমার খুব ভাল লাগত। আমরা একত্রে বেড়াতাম, তাস খেলতাম, পিকনিক করতাম, অভিনয়ে নামতাম। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, নন্দবাবু আমাকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারতেন না। ভদ্রলোক পরিত্যক্ত এক হিন্দুবাড়ীতে দালানের দোতলায় থাকতেন কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে একটা মেস করে। ওখানেই আমাদের আড্ডাটা জমত ভাল। ভূতের গল্প, সাপের গল্প থেকে শুরু করে আমাদের গল্পের পরিধি চন্দ্রলোক পর্যন্ত প্রসারিত হতো। ওঁ ভাল গাইতে পারতেন, আবৃত্তি করতে পারতেন, বৈঠকী গল্পেও ছিলেন ওস্তাদ। একাই একশ।

নন্দবাবু তাঁর জীবনের সব কথাই আমাকে দিনে দিনে বলে ফেললেন।

তবে একটা জায়গায় গিয়ে কেমন খটকা লাগলো। ও নিজ মুখেই ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যেতেন জীবনে কতবার, কীভাবে কৃষ্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত রাধাদের কাঁদিয়ে মথুরায় পাড়ি দিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে আরো আবিষ্কার করলাম, ওঁর স্বভাবের পরিবর্তন তখনও হয়নি। আজও সময় সুযোগ পেলেই ওঁর লালসার হস্ত প্রসারিত হয়।

নন্দবাবু বাড়ীর প্রসঙ্গ বড় একটা তুলতেন না। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা ছুটিছাটা পেলেই বাড়ী যেতো। কিন্তু নন্দবাবু বাড়ী যেতে চাইতেন না। কদাচিৎ এক আধদিনের জন্য যেতেন।

... ...

স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার ঝামেলা মিটে গেছে। ৮।১০ দিন ছুটি। কামকাজও কিছু হাতে নেই। কি করি, কি করি, ভাবছি। হঠাৎ নন্দবাবুকে প্রস্তাব দিয়ে বসলাম, চলুন না নন্দবাবু, আপনাদের এলাকাটা একবার ঘুরে আসা যাক। নন্দবাবু আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

কি যেন ভেবে নিলেন। বল্লেন, আমাদের ওখানেতো দেখবার মত কিছু নেই। না কোন ঐতিহাসিক, না অন্যদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু। একেবারে গেরাম। এমনকি একটা ভাল রাস্তাও নেই।

—তা হোক। তবুতো একটা নতুন জায়গা। ওতেই হবে।

—যাবেনই তা হলে ?

—হ্যাঁ যাবো।

—তবে চলুন।

—কালকেই তাহলে রওনা দেই সকালে রোদ ওঠার আগেই বের হয়ে পড়বো।

—ঠিক আছে।

যাবার ব্যবস্থা পাকা করে বাড়ী ফিরলাম। কিছুমাত্র সম্ভ্রম বোধ থাকলে এমন করে যাওয়া যায় না। নন্দবাবু যে একান্তই অনিচ্ছুক তা সম্যক উপলব্ধি করেও তাঁর বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি। আহম্মকি জেনেও না গিয়ে পাল্লাম না। একে একটা নেশা ছাড়া আর কি বলা যায় ?

... ...

রাত নটার দিকে আমরা নন্দবাবুর বাড়ীতে পৌঁছালাম। গোয়ালন্দ ষ্টীমার-ঘাট থেকে মাইল চারেক দূরে গ্রামের মধ্যে তাদের বাড়ী। বাড়ীতে মা-বাবা, ছোট একটা ভাই ও নন্দবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। আমাদের আগমন সংবাদে ওর বৃদ্ধ বাবা এগিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। মা ও ছোট ভাইয়ের সংগেও পরিচয় হ'লো। এবারে আর একজনকে দেখার জন্য ভারী কৌতূহল হ'লো। বসবার ঘরে একাকী বসে পুরানো একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছি। প্রশান্ত পল্লীর ক্রোড়ে নেমেছে ধ্যানগম্ভীর নীরবতা। পথশ্রান্তিতে বড্ড খারাপ লাগলেও মুখে কিছু প্রকাশ করিনি।

ঘণ্টাখানেক পরে একটা বাটিতে কিছু মুড়ি আর একটা কাপে চা নিয়ে এক মহিলা ঢুকলো। ওগুলো আমার সামনে টেবিলে রেখে বল্লো—

আপনার অনেক গল্প ওঁর মুখে শুনেছি। কিন্তু এখানে কখনো আসবেন, তা ভাবিনি। ভালোই হ'লো।

—নন্দবাবু তাহলে আমার কথা বলেছেন ?

—হ্যাঁ! খুব বলেছেন। আপনার সম্পর্কে ওঁর খুব ভালো ধারণা।

—তাই না কি ?

আমি মাথা নিচু করেই কথা বলছিলাম।

নন্দবাবুর স্ত্রী অনিমা বল্লো—

—নিন। খেতে খেতে কথা বলুন। না হয় চা-টা জুড়িয়ে যাবে যে।

এবার ওর মুখের দিকে তাকালাম। তাকিয়ে আমি খানিকটা অবাক হলাম। বহু সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন লাবণ্য, এমন লক্ষ্মীশ্রীতো কোথাও নজরে পড়েনি। ভাবলাম, ভাগ্যবান, নন্দবাবু সত্যিই ভাগ্যবান। এমন জিনিসতো হরধনু না ভাঙলে পাওয়া যায় না। বিধাতা বিশ্বের সমস্ত মমতা ও লাবণ্য মুখখানিতে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন।

রাত বারোটা নাগাদ রান্না-বাড়া হলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'লো। আমি শুয়ে পড়তেই ঘুমে ঢলে পড়লাম। সকালে

উঠেই বের হলাম এলাকাটা ঘুরে দেখতে। চারদিকই ঘুরলাম। অনেকের সাথে আলাপও হলো। তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নেই বটে; তবু আমার ভালো লাগলো। একটি ছোট নদী আর একটি অতি প্রাচীন বটগাছ তলায় আদ্যিকালের মন্দিরটিই বিশেষ দ্রষ্টব্য। আর কিছু নেই। ঘুরতে ঘুরতেই নন্দবাবু হঠাৎ বল্লেন—

—সুমনবাবু! আমাকে কিন্তু আজ বিকেলেই ছুটতে হবে। আপনি দিন দুই বেড়ান এখানে।

—তার মানে?

—মানে, আমার খুব কাজ ধান কাটার মরশুম তো। আজকাল খুব Collection হচ্ছে। আমি না থাকলে আপিস অচল। তাই আমাকে আজ যেতেই হবে।

আমি শুধু বিস্মিতই হলাম না, রুষ্টও হলাম। ভাবলাম, এ কোন্ জাতীয় ভদ্রলোক? এতো কষ্ট করে কালকে রাতে এলাম; আর আজকেই ফিরে যেতে হবে? পথশ্রান্তি দূর করার সময়টুকুও পাবো না? সেই কিংবদন্তীর বটতলার একটা মোটা শেকড়ের ওপর পাশাপাশি দু'জনে বসেছিলাম। আমার রাগে দুঃখে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। দু'জনেই নিরুত্তর। বটের পাতায় হাওয়া লেগে শাঁ শাঁ শব্দ উঠছিলো, আর আমার গাটা রি রি করছিলো। আত্ম-সমীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম, না এলেই ভালো হতো।

বেশ কিছুসময় নিরুত্তর থাকার পর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—চলুন, নন্দবাবু! স্নান-খাওয়া সেরেই বেরিয়ে পড়া যাক। গ্রামটা তো দেখাই হয়ে গেছে।

—না না, আপনি থাকুন। আমি জরুরী কাজের জন্য চলে যাচ্ছি বলে আপনিও যাবেন কেন? আপনি না হয় পরশু আসুন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। রাগে আমার রক্তের বেগ বেড়ে

গেল। বাড়ীতে ফিরে জিনিসপত্র গুছাতে লেগে গেলাম। এমন সময় অনিমা এসে একটুখানি হেসে বল্লে—আচ্ছা! কেমন মানুষ আপনারা? এই দারুণ শীতের কাক ভোরেই বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরলেন এই এগারোটায়। একটু চা-ও খাওয়া হলো না।

—সব দেখতে দেখতে দেরী হয়ে গেলো কিনা।

—কি আছে দেখার মতো? কি-ই বা দেখলেন?

—ঐ যা আছে তাই দেখলাম। তাছাড়া একজনকে দেখতে পাওয়াটাই সবচেয়ে বড দেখা ও শ্রেষ্ঠ পাওয়া হলো। হঠাৎ লজ্জায় অনিমার মুখ লাল হয়ে গেল। আমিও একটু অপ্রতিভ হলাম। কারোর মুখেই যেন আর কথা আসছিল না।

—ও কী! ব্যাগ গুছাচ্ছেন কেন?

—চলে যাব বলে।

—কবে যাবেন?

—এইতো স্নান-খাওয়া-দাওয়া সেরেই।

—সে কী! ২৪ ঘণ্টাও কাটলো না! এর মধ্যেই চলে যাবেন!

আমারও অনেক কাজ। তাছাড়া নন্দবাবুরতো কাজের পাহাড় জমে আছে। ওঁকে একরকম জোর করেই এনেছি।

হুঁ। জোর করে আর আনলেন কেন? আর কাজের পাহাড়ের কথা চিরকালইতো শুনে এলাম।

—ওঁ না এলে যে আমার আসা হয় না।

অনিমা মনে হল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তেল মেখে গিয়ে পুকুরে নামলাম। স্নানটা সেরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম একটা বটতলার উপন্যাস নিয়ে। একটু পরেই অনিমা ও নন্দবাবুর কথাবার্তা কানে এলো। পাশেই রান্নাঘর। ওখান থেকেই কথাগুলো আসছিলো। একেবারে আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথন।

—কাইল রাত্তিরে আইলা, আইজ দু'ফারেই চইলগা যাবা!

—কী করবো? আফিসে দারুণ কাজের চাপ।

—বাড়ীতে কি তোমার কোন কাজই নাই ?

—কাজ কল্লেই থাকে।

—কিছুইতো করো না। তোমারতো আসারই সময় হয় না। আইলেও যাই যাই করো। তোমার কাণ্ডই বোঝতে পারলাম না। তোমার কোন দয়া-মায়াও নাই ?

—ক্যান ? একথা কও ক্যান ?

—কবো না ! একবার তাকাও তো আমার দিকে। সইত্য কইরগা কওতো, কাজটা কি ভাল করতেছো ?

—বেলা কিন্তু অনেক হইয়া গেল। আমাগো কিন্তু যাইতেই হবে।

—তুমি কিরকম মানুষ, কও ত্যাখি ? একজন ভদ্দরলোক লইয়া আইছো। তারে এট্টু জিরাইতেও দিলা না !

—কি করবো, অনেক কাজ। তুমি এসব বোঝবা না।

—আমার আর কিছু বোঝবার দরকারও নাই।

অনিমার গলা ধরে এলো। চোখে দেখলে নিশ্চয়ই অশ্রু গোপন করতে দেখতাম। আমার উপন্যাস-পাঠ বন্ধ হয়ে গেলো।

....

অপরাহ্ন তিনটের সময় যখন আমরা যাত্রা করলাম তখন অনিমা হাত তুলে নমস্কার করে হাসিমুখে বিদায় জানালো। আবার আসতে বল্লো।

বাড়ী ছেড়ে এগিয়ে আসছি। মনটা খুব খারাপ লাগছে। নন্দবাবু কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক। আগে আগে হাঁটছেন। আমি রাস্তাটা যেখানে বেঁকে গেছে ওখানে এসে একবার ফিরে তাকালাম। দেখলাম বারান্দার প্রান্তে যে খুঁটিটার কাছে আগে দাঁড়িয়েছিলো তাতেই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনিমা। অপলক নেত্রে স্বামীর যাত্রাপথের দিকেই চেয়ে আছে। নন্দবাবু একবারও ফিরলেন না। আমি দেখলাম পটে আঁকা ছবির মতো মুখখানা কি ম্লান। আমরা গাছপালার অন্তরালে মিলিয়ে গেলাম। আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। সঙ্গীটির ওপর কেন যেন ভীষণ রাগ ও বিরূপতার সৃষ্টি হলো। বারবার প্রশ্ন তোলপাড়

করতে লাগলো মনের মধ্যে। এলোকটিতো সন্ন্যাসী নয়, বীতরাগ মহাপুরুষও নয়। বরং কলির কেষ্টর ক্ষুদ্র সংস্করণ। অথচ এমন করে চলে যাচ্ছেন কেন? চলে তো যাচ্ছেনই, তা আবার নির্বিকার চিত্তে। ছু'জনে হাঁটছি। উভয়েই নির্বাক। আমি ভাবছি, এবাড়ীতে না এলেই ভালো হ'তো। এলোমেলো অনেক কথাই ভাবছি। নন্দ সন্ন্যালের সঙ্গে এতদিন মিশলাম; অথচ ওঁকে তো কিছুই জানতে পারিনি। আমার সঙ্গীটি কি মানুষ? এর কি হৃদয় বলে কিছু নেই? এমন শান্তির নীড়ে এর মন টেকে না কেন? কেন এই দারুণ শীত মাথায় নিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে অনিমার মত স্ত্রীরত্নটিকে কাঁদিয়ে? আমার কেন'র জবাব কে দেবে? হঠাৎ নন্দবাবু বল্লেন, কথা বলছেন না কেন, সুমনবাবু?

—উঁ! ভীষণ অন্য মনস্কভাবে উত্তর দিলাম।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে হাতড়িয়ে কোন কোন জিনিস উদ্ধার করা যায়, অতলান্ত বারিধির তলা থেকে ছুরন্ত ডুবুরী মুক্তো তুলে আনে, শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্র বহুদূরের জিনিসকে দেখতে সাহায্য করে; কিন্তু কেমন করে, কী উপায়ে আমি নন্দ সান্যালের মনের গহন অন্ধকার জগতে অন্বেষণ করে দেখবো যে, অনিমার প্রতি ওর এই অনির্বাচনীয় নিস্পৃহতা কেন?

ঃ শিল্পী ঃ

দেবু, বাড়ী আছ নি ? ও দেবু ! দে-ব-উ !

—বাড়ী আছে। এহোনো ওঠে নাই।

—অ্যাতো ব্যালা হইচে, তবু ওঠে নাই ক্যান ?

এ প্রশ্নের উত্তরে কমলা কাম ঘরের বাঁশের পুরোনো খুঁটিটা ধরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কি জবাব দেবে সে ? কে-ই বা তার জবাবের মানে বুঝবে ? এই জমিদারের চাকর হতচ্ছাড়া লোকনাথ ? না, না, কেউ বুঝবে না, কেউ বুঝবে না তাদের কথা। যার প্রয়োজন, সে-ই আসবে, হাঁক দেবে, চোখ রাঙাবে, প্রয়োজনে ভয় দেখাবে—জোর খাঁটাতে চাইবে। কিন্তু একবারও কি তাদের ব্যথা ভেবে দেখবে ?

—পশুদিন কইয়া গ্যালাম, বড় কত্তা ডাকচে। তবু দেবু যে গ্যাল না, ব্যাপার কি ? সে কি মগের মুল্লুক পাইচে ?

—নানা, শরীড্ডাই ভাল না, তাই যাতি পারে নাই। আমরা মগের মুল্লুক পাব ক্যান ? আমরা তো বড়োকত্তার আশ্রয়েই রইচি।

—এডা তোমাগো মুহের কথা, কাজের না। আমি আবারও আইলাম। ভাল চাওতো পাডাইয়া দিও। বক্তব্য শেষ করে আর কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই লোকনাথ হনহন করে চলে যায়। তার চলন ভঙ্গি থেকে ফুটে ওঠে একটা অনমনীয় নিষ্ঠুরতা। কমলা চুপ করে খুঁটিটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত সে সরা গড়েছে। ভোরের দিকে তার বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না ; তবু নিরুপায়ের মতই উঠে পড়ল। কারণ মাটির যে পাতগুলো রাতে করে রেখেছে, তা দিয়ে সকালে সরাগুলো না বানালে মাটিটা শুকিয়ে যাবে। স্বামী অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছে। ফিরেই কমলাকে অশ্লীল খিস্তি মেরেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। কমলা বারবার ভাত খেতে ডাকলেও দেবু সাড়া দেয়নি। বিছানায় শুয়ে কমলার একটা অসহ্য দুর্গন্ধ নাকে এলো।

—ইস্! আবার তুমি গাঁজা খাইচ? তোমারে না মাথার দিব্যি দিলাম?

—তুইও খা। ভাল থাক্‌বি।

—গাঁজা খাইয়া কেউ ভাল থাকে?

—থাকে থাকে। এই যে আমি আছি না?

কমলা স্বামীর দিকে পিঠ ফিরে চুপ করে বসে থাকে। একে তো অতি ময়লা ছেঁড়া বিছানা; তার ওপর আবার গাঁজার ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। সে তো সহ্যই করতে পারছে না। কেমন করে এর পাশে রাত কাটাবে? একে তো একটা লাসের মত পড়ে আছে, তার ওপর কী বিশ্রী গন্ধ! তার নাড়ী উল্টে বমি আসে। ছোট্ট কুটির! গোলপাতার ছাউনি, বাঁশের খুটি। একপাশে এই ছোট্ট বাঁশের মাঁচা যার ওপর হাঁড়ি পাতিল দিয়ে এমন করে ঠাঁসা যে কোথাও একটু শোবার জায়গা করা সম্ভব নয়। আর কামঘর? সেখানে তো বেড়া নেই। তাছাড়া স্যাঁত-সেতে মাটি। মাটিতে না হয় আঁচল পেতেই সে শুলো। কিন্তু তার তো একেবারেই কাঁচা বয়স। যদি কিছু একটা—না, সে আর ভাবতে পারে না। তার কান্না আসে। অথচ কেঁদেই বা কি করবে? লোকটাতো এমন ছিল না। তাই কমলার রাগ হোলেও সামলে নেয়। বছরখানেক আগেও তো গাঁজা স্পর্শ করত না। সম্প্রতি কীর্তনের আসর, তেরাতের মেলা, সত্যপীরের পাঁচালীপাঠ, সব আসরেই আছে। তাছাড়া নদীপাড়ের বটতলায় ন্যাংটা সাধুর আখড়ায়ও যাতায়াত শুরু করছে। গাঁজা, ভাঙ দুটোই শুরু করেছে।

প্রায়ই সে গাঁজা খায়। অনেক রাতে বুঁদ হয়ে ঘরে ফেরে, বউকে খিস্তি মারে। মাঝে মাঝে কমলার গায়ে হাতও তোলে। অথচ কাজ করতে চায় না। বিশেষ করে কোন মূর্তি সে গড়াতে চায় না। কমলা যে হাঁড়ি, সরা গড়ায় ওগুলো পোড়ানো হলে মাঝে মধ্যে দূরের গ্রামে গিয়ে ফেরী করে আসে। এই যে দুর্গো পুজো, লক্ষ্মী পূজো, কালী পূজো গেল; সে কোন প্রতিমাই গড়ল না। আবার কার্তিক পূজো এসে গেছে। এখনো যদি কিছু কার্তিকের মূর্তি গড়ে স্বামী, তবে

সংসারে অনটন ঘোচে। কিন্তু কিছুতেই সে তা গড়াবে না।

এই সময় ঘর থেকে ময়লা কাপড় পরা দেবু চোখ রগড়াতে রগড়াতে কামঘরের দাওয়ায় এসে বসল। তার চোখ দুটো তখনও লাল হয়ে আছে। সমস্ত মুখে চোখে কেমন ক্লান্তির ছাপ।

—তুই অমন কইরা দাড়াইছস ক্যান? দ্যাখলে মনে হয়, তুই যেন কি চিন্তা করছস?

—কি আবার চিন্তা করব। বড় কত্তার ওইখানথ্যা লোকনাথ আইছিল।

—ক্যা? আইছে ক্যা? আমিতো কইয়াই দিচি। আমি পারুম না। অন্য কুমার দিয়া গড়াউক।

—তোমার হে কথা শোনবে? জমিদারের সংগে একটা বাধাঁইয়া এইখানে বাস করতে পারবা? তুমিও মারা পড়বা—আমাকেও ভাসাইয়া যাবা।

—তুইতো নিজের কথাই খালি ভাবস। কোমলা, তুই নিজের কথা ছাড়া কিছু ভাবস না।

—বাজে কথা রাখোছি জমিদারের কাম কইর‍্যা দ্যাও। নইলে মাথা থাকবে না।

—যা যা, জমিদারগো আর সেই দিন নাই। আমি পারুম না। কইয়াইতো দিছি। এই হাতে আর মাটি ধরুম না।

—আচ্ছা দ্যাহা যাবে। মাইর-ও খাবা, কামও করবা।

—কোমলা! হারামজাদী, তুই রাত্তিরে ছিলি কোথায়?

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো কমলা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সে ছড়বেছড় বলে যেতে থাকে। লজ্জা করে না? ভাঙ খাও; গাঁজা খাও। কেত্তনের আসরে যাইয়া মাতলামি কর। ল্যাংটা সাধুর ওইখানে গিয়া মহাদেব হও। আর ঘরে এট্টা কাম কর না। মাটিতে এট্টু-আতও দ্যাও না। এট্টা বর্ষাকাল গেল, ঘরের চালের ছাউনিটা ম্যারামত কল্লা না? শিব ঠাকুর হইতে চাও? ভাল চাওতো মাথা ঠিক কইরা বড় কত্তার কাজ কইর‍্যা দ্যাও।

—করুম না। আমি কইলাম, করুমনা। এই হাত দিয়া আর মাটি ধরুম না।

—গরীবের পির্‌তিজ্ঞা চলে না। ও-সব বড়লোকের সাজে। ছোট-মুখে বড় কথা মানায় না।

—মানায়, মানায়! দিনকালের হ্যারফ্যার হইয়া গ্যাছে। জমিদারের ভিটায় থাকি। নইলে থাকুম না। চইল্যা যাব আর এক জায়গায়।

—কোথায় যাবা শুনি? তোমার মুরোদ আমি জানি না? লজ্জা-শরম থাকলে আমার হাড়ভাঙা খাটনির আয় খাইয়া তুমি বাহাত্তুরি ফলাইত্যা না।

—কি বললি?

স্বামী গায়ে হাত দেবে অথবা কোন একটা বিপদ ঘটাবে মনে করে কমলা সেখান থেকে দ্রুত সরে যায়।

দিন তুই পরের কথা। কামঘরে বসে দেবু পুরোনো হুকোটায় ধীরে ধীরে তামাক টানছিল। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কমলা পাশের এক বাড়ীতে একটা কার্তিকের ছাঁচ আনতে গেছে। সামনেই কার্তিক পূজো। যদি কিছু ছাঁচের কার্তিক বানিয়ে বিক্রি করা যায়। হঠাৎ দেবুর মনে হোল, আজ কদিন থেকে কমলার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। আহা ওর কত খাটনি। সে নিজে-তো একরকম কিছুই করে না। কমলাইতো সংসারের হাল ধরে রেখেছে। একমাত্র ছেলেটা মারা যাওয়ার পর থেকে দেবু প্রথমটায় প্রায় উন্মাদ হয়েই গিয়েছিল। পরে মাথাটা ঠিক হয়ে এলেও স্বাভাবিক মানুষের মত কাজকর্ম করা তার পক্ষে আর হয়ে ওঠেনি। মাটির কাজ তো একদম ছেড়েই দিয়েছে। কিছুদিন হলো সে নেশা করা শুরু করেছে। সূর্য নেমে যেতে থাকলেই তার শরীর কেমন কেমন করতে থাকে। সন্ধ্যার আগেই সে বেরিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই তার তু'তিনজন সংগীও জুটে গেছে। কিন্তু আজ অপরাহ্ণে এ নির্জন বাড়ীতে একলা বসে বসে হঠাৎ কমলার জন্য তার বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। আহা! কতই বা ওর বয়স! এরই মধ্যে অত বড় পুত্র-শোকটা তার

বুকে এসে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত লেগেছে। তবু সে তো সামলেছে। কিন্তু দেবু সামলাতে পারে নি।

—এই দেবু। বাড়ীতেই আছস। চল তোরে ধইর্যা লইয়া যাওয়ার হুকুম হইচে?

—কেড়া হুকুম দিছে রে?

—হুকুম দিছে তোর বাপ। হারামজাদা শয়তান, নচ্ছার, পাজি, বদমাইশ। তোরে বারবার বাড়ী আইস্যা কইয়া গ্যালাম, তবুও তুই গ্যালি না? বড় কত্তারে অপমান?

—গালাগালি দিওনা কইলাম। ভাল হবে না।

—কি করবি, শুনি?

—আমি যাব না। বল যাইয়া তোর বড় কত্তারে। কাত্তিক আমি গড়াতি পারুম না।

—বড় কত্তার কাত্তিক তোর বাপ গড়াবে।

—না। গড়াবে না। আমার বাপও গড়াবে না, আমিও গড়াবো না। কেন গড়াবো? কিসের বড়কত্তা? আমার একমাত্র ছাওয়ালডা যেদিন মললো, সেদিনকি তোর বড়কত্তা একবার আইচে?

—কি, এত্তবড় কথা?

—হ হ। এতো বড় কথা। আমি যাবো না।

এ ঘটনার পরদিন দুপুরবেলা কমলা নিজে গিয়ে যখন জমিদারের হাতে পায়ে ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করে চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটীর সঙ্গে পিছ-মোড়া করে বাঁধা দেবুকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল, তখন গ্রামের কৌতূহলী জনতা এ দম্পতিটিকে বিশেষ কৌতূহল নিয়েই দেখতে এল। কিন্তু দেবু বা কমলা কেউই আদৌ মুখ খুলল না। কোনমতে দুটো ভাত ফুটিয়ে একটা শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে দু'জনে কিছু খেল। দেবু ঘরের মাঁচায় নিঃশব্দে শুয়ে আছে। মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। ঘরের চার পাঁচ জায়গায় মাটির সরা পেতে দিল কমলা। তারপর একখানা কাঁথা এনে স্বামীর গায়ে চাপিয়ে দিয়ে তার পাশে বসল। হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে কমলা শুধালো—

—কি দিয়া মারছে তোমারে ?

—লাঠি।

স্বামীর ডান হাতখানা দু'হাতের মধ্যে নিয়ে খুব আলতোভাবে আঙুলগুলো টানতে থাকে। দেবু মাঝে মাঝে ফোঁসফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কারোর মুখেই কোন কথা আসে না। বাইরে ধারা বর্ষণ চলেছে, আর ভেতরে এ'দুটি প্রাণীর অশ্রুবর্ষণ। বর্ষাধারার দর্শক আছে কিন্তু এ ধারার দর্শক কই ? তার আরম্ভ আছে, শেষও আছে। কিন্তু এ অশ্রুপাতের আরম্ভ আছে, কিন্তু এখতো শেষ নেই। যুগ যুগান্ত ধরে এমনি করে কত নীরব অশ্রুবর্ষণই না হয়েছে। কে তার হিসেব রেখেছে ? কমলা সেদিনই বলেছিল, ছোটমুখে বড় কথা মানায় না। তাইতো হোল। জমিদারের বারবার তলব সত্ত্বেও দেবু জমিদার বাড়ীতে যায়নি। লোকনাথকে সে উন্মাদের মত কথা বলেছে। এদিনও জমিদারের লোকেরা তাকে ডাকতে এলে সে তাদের আক্রমণ করতে গেছে। তারপরের ইতিহাস স্বল্প। পাঁচ ছ'জনে মিলে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। চণ্ডীমণ্ডপে ফেলে নির্মমভাবে মারা হয়েছে। তারপর চোরের মত তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তবুও জমিদার বলেছিলেন—

—দেবু, তুই রাজী হ। আমার ছোট ছেলেটার মানত পূজার তুই কার্তিক গড়িয়ে দে। আমার বংশের কুমার। অন্য লোক দিয়ে গড়ালে আমার মন সারে না। তুই গড়িয়ে দে। আজ দশ বারো পুরুষ ধরে তোরা আমাদের পারিবারিক সমস্ত জিনিষ করে দিস। এখন হঠাৎ না বলিস কেন ? তুই হয়তো ভেবেছিস, তোকে কিছু দেব না। তা নয়। তুই একখানা ধুতি আর একখানা গামছা পাবি। বউ পাবে একখানা শাড়ী। তাছাড়া নগদও কিছু দেব।

—আমি পারুম না, বড়কত্তা।

—তবুও বলছিস, পারবি না ?

না, পারুম না।

—পারবি না ? তাহলে আমার ভিটা ছেড়ে দিতে হবে ! আর আগের খাজনাতো তামাদি হয়ে গেছে ! গত তিন বছরের খাজনা দিবি।

—খাজনা দিতে পারুম না। ভিটা ছাইড়া চইল্যা যামু।

—খাজনাও দিবি, ভিটাও ছাড়বি। তা তোর এতো জেদ কেন, শুনি ?

—ছওয়ালডা মইরা যাওয়ার পর থেইক্যা আর মাটিতে হাত্ত দেই না। আর দেবও না।

—ও। সেই কথা ? ও দুঃখ ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর। মরা ছাওয়াল আর ফিরবে না। অযথা বিপদ ঘাড়ে নিস না। আমার জমিদারী ছেড়ে গেলে ভিক্ষে করে বেড়াবি।

—তাই করবো।

—শয়তান। আবার লম্বা কথা। দেখি আমার লাঠিটা।

দ্বিতীয় দফা মারের যখন উদ্যোগ হচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই কমলা গিয়ে ঝড়ের বেগে জমিদারের সামনে দাঁড়ায়। অনেক কাকুতি মিনতি করে কার্তিক গড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কমলাই স্বামীকে ছাড়িয়ে এনেছে। দেবু তখনও আস্ফালন করছিল। কিন্তু কমলা জমিদারকে বুঝিয়ে, স্বামীর মস্তিস্ক বিকৃতির দোহাই পেড়ে, কার্তিক গড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে এসেছে।

কিন্তু গেঁজেল স্বামী যদি কিছুতেই কমলার কথা না শোনে, তাহলে আবার স্বামীর লাঞ্ছনাতো হবেই, কমলাও হয়তো বাদ যাবে না। যে করেই হোক্ স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতেই হবে। অন্যথায় বিপদ আর লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। একে তো ঘরে অভাবের অন্ত নেই, হাঁড়িতে চাল বাড়ন্ত, ঘরের চালে শতছিদ্র. তার ওপর একি নতুন লাঞ্ছনা !

কমলা একটু জোরে আঙুলে চাপ দিয়ে বলে, তোমার পায়ে পড়ি। আর রাগারাগি কইর না। এইবার রাজী হইয়া যাও। উত্তরে দেবু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্ত নামে গ্রামের প্রান্তে। কমলা স্বামীর পিঠের ওপর মাথা রেখে খুব বিনয়ের সুরে বলল, "আমার মাথা খাও। কাত্তিকখান গড়াইয়া ছাও।" প্রতিপক্ষ একখণ্ড গাছের গুঁড়ির মত পড়ে থাকে। ওর মধ্যে যেন আর

কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই। কেবল একটা প্রতিবাদ আগ্নেয়গিরির লাভার মত বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়। অথচ কোন পথ সে দেখতে পায় না। কমলার কোমল স্পর্শে, তার ব্যাকুল আবেদনে দেবু যেন কেমন হয়ে যায়। কিন্তু কমলাতো দেখতে পাচ্ছে না যে দেবুর দুচোখ বেয়ে জলের দুটি ক্ষীণ ধারা নেমেছে। আস্তে আস্তে দেবু তার ডান হাতখানা কমলার মাথার ওপর বোলাতে থাকে। অবলা জীব যেমন মানুষের নীরব আদরের স্পর্শ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, কমলাও ঠিক এই মুহূর্তে জমিদার-বাড়ীতে লাঞ্ছিত পুত্রশোকাতুর অর্ধোন্মাদ স্বামীটির নীরব আদরের স্পর্শটুকু পেয়ে একে-বারেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে গরীব। সে মূর্খ। সে ভালো করে নিজের মনের কথা গুছিয়ে স্বামীকে বলতে পারে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরে সে স্বামীর কাছে আসতে পারে না। সারাদিন তাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। স্বামীর প্রতি সব কর্তব্য পালনও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ স্বামীটিইতো একদিন শান্ত সুবোধ মানুষ ছিল। কিন্তু আজ সে, ভাঙখোর, গেঁজেল, নিষ্কর্মা। আসলে ছেলেটাই সংসারটা মাটি করে দিয়ে গেল।

গত বছর ঠিক কার্তিক পূজোর দিন তার ছেলে, একমাত্র সন্তান, পাঁচ বছরের নিতাই কলেরায় মারা গেল। সে বিভীষিকাময় দিনটার কথা স্মরণে এলেই কমলা পাগোল হয়ে ওঠে। তাই সে ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। অজস্র কাজের মধ্যে, অমানুষিক খাটুনির মধ্যে সে ডুবে থাকে। আর স্বামীটি? সে ধরেছে ঠিক বিপরীত পথ। সে ছেড়ে দিয়েছে মাটি। নেশাই হয়েছে তার কাছে খাঁটি। সেও ভুলতে চায়, কাজের মধ্যে ডুবে থেকে নয়, নেশায় বুঁদ হয়ে। কোনদিন সে কমলার গায়ে হাত তোলে নি। পাশের বাড়ীর উপেন, মাধব, কৈলাস বৌকে মারলে দেবুই গিয়ে ঠেকাত, তাদের গালি দিত। এসব দেখে শুনে কমলার আনন্দে ও গর্বে বুক ফুলে উঠত। সে ভাবত, আমার স্বামী অশিক্ষিত, কিন্তু অমানুষ নয়। কিন্তু আজ দেবু নিতান্তই বদলে গেছে। আজকাল মাঝে মাঝে সে কমলাকে মারে। অনেকদিন হয় স্বামীর সোহাগ সে পায়নি। ওটা যেন সে ভুলতেই বসেছে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এমন

বাদল দিনে স্বামীর সামান্য সোহাগই তার কাছে বিরাট হয়ে দেখা দিল। অনেকদিন থেকে স্বামীর বিরুদ্ধে জমে থাকা অপমান, অভিমান, অভিযোগ সব মুহূর্তে জল হয়ে গেল। তার যেন বলতে ইচ্ছা হোল, এই তোমার পিঠের বাড়িগুলা যেন আমার পিঠেই পড়ছে।

……পরদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই দেবু ঘরে ফিরে এল। বউকে বলল, ছাখ কোমলা, আজ আর নেশা করা গেল না। তোর কাছে পয়সা আছে ?

—কেন ?

—কয়ডা বিড়ি আনতাম।

—ঠিক আছে, তুমি বইসো। আমি বিড়ি লইয়া আইসি। ঘরে ঢুকে শিঁকার মধ্যে পরপর ঝোলানো হাঁড়িগুলোর একটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ক'টা পয়সা বের করে পাশের বাড়ীর দোকান থেকে কমলা বিড়ি আনতে চলে যায়। দেবু কামঘরে মাটি-মাখানো তক্তাটার ওপরে চুপ করে বসে থাকে। কত কথাই তো তার মাথার মধ্যে আসে। কিন্তু কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। আজকাল তার চিন্তাশক্তি খুব কমে গেছে। একমাত্র নেশা করলেই সে ভালো থাকে। কারণ নেশা সাময়িকভাবে সমস্ত চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি দেয়। কমলা এক প্যাকেট বিড়ি নিয়ে ফিরে আসে। দেবুর মুখে কেমন একটু স্মিত হাসি ফুটে ওঠে।

—এতগুলা বিড়ি আনলি ?

—হ। আনলাম। ইচ্ছা মত খাও।

কমলা ঘর থেকে দেশলাইটা এনে দেয়। একটা বিড়ি ধরিয়ে দেবু মনের আনন্দে টানতে থাকে।

—সে-দিন যে কইলি তোর কাছে পয়সা নাই ? আজ আইল কোথাথ্যা ?

—এই সামান্য দুই একটা পয়সার দিকে তোমার নজর কেন ? এই দিকে পুরুষ লোকের দিষ্টি দিতে নাই।

—হ্যাঁরে কোমলা। আমারে কিছু পয়সা দিবি ?

—তোমারে তো বিড়ি আইন্যা দিলাম। আবার পয়সা চাও ক্যান ?

—সাজি মশার দোকান থ্যাইক্যা এক আনা গাঁজা আনুম।

কমলা আর্ত্তনাদ করে ওঠে। কাঁদ কাঁদ সুরে সে প্রশ্ন করে, "শ্যাষকালে ঘরডারে তুমি গাঁজার আখড়া বানাইবা ?"

—না না। আমি গাঁজার আখড়া বানাব না। আইজগের জন্য খালি খাব।

—ঠিক আছে। আমি নিজে যাইয়া সাজি মশাইর কাছ থেইক্যা তোমার গাঁজা আইন্যা দেব। তুমি আগে আমার কথা শোনো।

—দিবি তো ?

—হ, দেব।

—তয় ক, কি কথা।

কমলা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে বাঁশের আড়ার ওপর বাঁশ পেতে রাখা বড় এক আঁটি খড় এবং কিছু সূতলী এনে স্বামীর সামনে রাখে।

—এই ন্যাও। কাত্তিকের ব্যানাডা আগে বানাইয়া ফ্যালো।

—তুই আমারে দিয়া কাত্তিক বানাবি-ই ?

—হ। আর কথা বাড়াইও না।

দেবু ফ্যাল ফ্যাল করে কমলার মুখের দিকে তাকায়। কি একটা উদাস দৃষ্টি মেলে সে কমলার চোখদুটো ভাল করে দেখে। কমলা স্বামীর ঘোলাটে চোখের মধ্যে কি একটা মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখতে পায়। তার ভয় হয়। মাটির কুপীতে কেরোসিন ভরে আলো ধরিয়ে কমলা নিয়ে আসে। এসে দেখে দেবু চুপ করে বসে আছে। কমলা অতি কোমল কণ্ঠে সোহাগের সুরে বলে, ন্যাও, হাত লাগাও, আমি মাটিডা ঠিক কইর‍্যা ফেলি। মধ্যিখানে তো আর তিনড্যা দিন আছে। এ্যার মধ্যে তো আবার শুকানা চাই। নইলে, তো রং ধরবে না। আর দ্যাখো, যদি সুন্দর মূর্ত্তি বানাইতে পারো, তাইলে জমিদার একটা বড় বখশিস দিতে পারে। ছোট পোলার মানত কি-না। বড়লোকদের মর্জি কখন কার উপর পড়বে, কেউ কইতে পারে না। ন্যাও ন্যাও, হাত দ্যাও।

কমলা কামঘরের অন্যপ্রান্তে স্তূপ করে রাখা এঁটেল মাটি ছোট কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে থাকে। একসময় আড় চোখে চেয়ে দেখে, দেবু মাথা নীচু করে খড় আর সুতলী দিয়ে ব্যানা বাঁধছে। তার আনন্দ হয়, আবার মনটা হু হু করেও ওঠে। আহা ; নিতাই চলে যাওয়ার পর বছর ঘুরে এল। এই প্রথম দেবু খড়ে হাত দিল। গেলবার ঘরে ঘরে যখন ধুম করে কার্তিকপুজো হচ্ছিল। তখন দেবুর ঘরের অদূরে গাব গাছটার তলায় তার নিতাই-এর পাঁচ বছরের ফুলের মত নরম দেহটা দাউদাউ করে জ্বলছিল। দেবুকে জোর করে ঘরের মধ্যে তিন চার জনে ধরে রেখেছিল। আর কমলাকে ঘুমের ঔষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যাক্ সে সব কথা। কমলা ভুলতে চায়, কে নিতাই ? তার সাথে তার সম্পর্ক কি ? সে যদি তার ছেলেই হবে তবে অমন করে চলে যাবে কেন ? কোদাল-কাটা মাটিতে ঝপাং করে খানিক জল ঢেলে দিয়ে খানিকটা তুষ বিছিয়ে কমলা পা দিয়ে মাড়াতে থাকে।

ওই তো সুতলীর প্যাঁচে প্যাঁচে কেমন একটি খড়ের কঙ্কাল তৈরী হচ্ছে। খানিক পরে আর কিছু তুষ ছড়িয়ে আবার জল ঢেলে দেয়, আবার মাড়াতে থাকে। কিছু সময় পরে হাতদিয়ে মাটিগুলো গুছিয়ে বড় একটা মাটির তাল বানিয়ে স্বামীর কাছে রাখে। পুরোনো একখানা কার্তিকের কাঠামো এনে দেবুর হাতে দেয়। এবারে কাঠামোটা ঠিক করতে বসে দেবু। কমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। না, আরতো দাঁড়িয়ে দেখলে চলবে না। এবার তাকে উনুন ধরাতে হবে, ভাত রাঁধতে হবে। সে উনুন ধরাতে চলে যায়। এদিকে বাঁশ ও দায়ের টকাটক ঠকাঠক শব্দ আসতে থাকে। অনেকদিন পরে আজ কমলা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ক্রমে রাত গভীর হয়ে আসে। অজ পাড়াগাঁর এ ছোট্ট কুমোর পাড়ায় নিস্তব্ধতা ভীষণভাবে অনুভূত হয়। দেবু কামঘরের মাটিমাখা তক্তাটার ওপর খালিগায়ে বসে খড়ের কঙ্কালে মাটিদিয়ে কার্তিক গড়ছে। চারদিন পরে জমিদারের কনিষ্ঠ পুত্রের কল্যাণে সাড়ম্বরে পুজো হবে। কমলা বলেছে মূর্ত্তি ভাল হলে জমিদার তার পুরুষানুক্রমিক পালকে বখসিস

দেবে। বখসিসে তার দরকার নেই। সেদিন বহু মানুষের চোখের সামনে জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপে প্রকাশ্য দিবালোকে সে যে বখসিস পেয়েছে, তার বোঝাই সে বইতে পারছে না। আবার কোন্ বখসিস তাকে কোন্ নতুন বিপদের দিকে টেনে নেবে।

দলাদলা মাটিদিয়ে খড়ের কঙ্কালের ওপর ক্রমশ: গড়ে উঠছে একটি দেহ। একে সুন্দর করে তুলতে হবে। কারণ, এতে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কাঠামোর ওপর কার্তিক দাঁড়ানো। তাঁর বাঁ পায়ের তলায় ময়ূরটি বসা। ডান হাতে একটা তীর, বাঁ কাঁধে ধনুক। সুন্দর মুখ গড়ে, ভালো রং করে, জমিদারকে দিয়ে আসবে সে। আর যাই হোক্ তার পূর্বপুরুষেরা বারবার জমিদার বাড়ীতে প্রতিমা গড়ে দিয়ে ইনাম পেয়েছে। বিশ-পঁচিশখানা গ্রামের মধ্যে একডাকে তার ঠাকুরদাকে চিনতো। বাবাও ছিলো বড় শিল্পী। নরম এঁটেল মাটিকে বাবা যা বলত, মাটি যেন তার কথা শুনতো। তারই ছেলে হয়ে দেবু ত ঐতিহ্য নষ্ট করতে পারে না। ইনাম সে চায় না। প্রশংসারও ধার ধারে না। শুধু ইজ্জত রক্ষা করা চাই। পিতৃপুরুষের সুনামটুকু সে কিছুতেই খোয়াতে পারে না।

কমলা কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে, দেবু টেরই পায়নি। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে দেখে কমলা বলল—'অনেক রাত্তির হইচে। এহন আর থাউক। কাইল সকালে আবার কইরো।

—তুই কাজে যাতো। বগ্ বগ্ করিস না।

—না না, তুমি খাইয়া লও, তারপর কাম হবে।

—যা কইলাম, এইখান থ্যা। তুই যাইয়া খাইয়া শুইয়া পড়। আমর কাম হইলে আইব।

আরও কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে কমলা স্বামীকে আর ঘাটাতে সাহস পায় না। শরীরেও তার আর কুলায় না। তাই কিছু খেয়ে নিয়ে স্বামীর জন্য খাবার ঢেকে রেখে শুয়ে পড়তে যায়। দেবু হাঁকে—

এই কুপীতে এট্টু ত্যাল দিয়া যা। কমলা কুপীতে তেল ভরে দেয়। স্বামীর গায়ে একটা কাঁথাও জড়িয়ে দেয়। তোমার খাবার ডাকা আছে। শোবার আগে খাইয়া লইও।

এবার দেবু নিশ্চিন্তে কাজ করতে থাকে। পাশে হাঁড়িতে জল, বাঁশের তৈরী ছোট দু'খানা কামকাঠি। আর রয়েছে তার বিড়ির প্যাকেট। মাঝে মাঝে বিড়ি টানে, আর আপন মনে নীরবে কাজ করে। দূরে কোথায় যেন ক'টা শিয়াল সমবেতভাবে ডেকে উঠল। নিশাচর বাদুড়-গুলো পেছনে দেবদারু গাছটার ওপর পাখা ঝাপটাচ্ছে। তার যেন শীত শীত করে উঠল গা টা। কমলা যে ময়লা কাঁথাটা তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে গেছে, তাতেও যেন শীত মানাচ্ছে না।

সব হয়ে গেছে। এবারে মুখখানা গড়লেই হয়ে যায়। রাত অনেক হোল। নদীপাড়ের বটগাছটায় বাসাবেঁধে-থাকা বাজপাখীটা মধ্যরাত্রির সংকেত ঘোষণা করল।

দেবুর মনে পড়ে, তার জীবনের ফেলে-আসা দু'একটি দিনের কথা। সেবার সে এমনই এক কার্তিক পূজোর আগে কার্তিক গড়াচ্ছিল। নিতাই এসে বারবার তার কামকাঠিটা দিয়ে কার্তিকের জাগায়-বেজাগায় খোঁচা মারছিল। আবার ওটা দিয়ে দেবুর পিঠেও সে দাগ টানছিল। দেবু ধমকালে নিতাই তার পিঠে কামড় মেরে পালিয়ে গিয়েছিল। একটু পরে আবার ফিরে এসে তার চুল ধরে পিছন থেকে হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। আর একদিন দেবু ছাঁচের সরস্বতী বানাচ্ছিল। একখানা কাঁচা সরস্বতীকে সে মাড়িয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়েছিলো। আবার সে মাঝে মাঝে নিজেই মাটি দিয়ে পুতুল বানিয়ে রোদে শুকোতে দিত। সেগুলো কোন অবয়ব পেত না। কিন্তু ওর কাছে ওগুলোই পরম আদরের বস্তু হয়ে উঠতো। নিতাই-এর টানাটানা চোখ, উন্নত নাসিকা, ছোট পাতলা ঠোঁট, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত ললাট। আহা! কি সুন্দর ছেলে। দরিদ্রের ঘরে, হতভাগ্যের ঘরে, অমন দেবশিশু থাকবে কেন? তাই অভিমান করে চলে গেল। ডাক্তার ডাকারও সময় পেল না দেবু। হু হু করে ওঠে বুকের ভেতরটা দেবুর।

খাবলা খাবলা মাটিতে ক্রমশঃ একটা মুখ গড়ে ওঠে। তারপর কাম-কাঠির টানে টানে চোখ, চোখের মণি, নাক, নাসাগহ্বর, ঠোঁট, কান, চিবুক আপনার রূপ লাভ করে। মাথায় থোকা থোকা চুল, পিছুনের দিকে উলটে আঁচড়ানো। রাত গভীরতর হয়। আজ আর কেউ আসবে না। কেউ তার কাজে বাধা দেবে না। কোনরূপ বিরক্ত করবে না। পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর ঠোঁটে দুষ্টু হাসি হাসবে না। আজ শূন্য বাড়ী। একদম খাঁ খাঁ করছে। কমলা পুত্রশোকের পাষাণ বুকে চেপে, নীরবে কাজ করে, সংসার চালায়। দেবু মাটি ছোঁয় না। গত একটি বছর। মাটি ছুঁতে গেলেই তার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। সামনে এমন একটা গহ্বর সৃষ্টি হয় যা ভরাট করার মতো কোন পদার্থই সে খুঁজে পায় না। সে জীবিত থেকেও মৃত। তার একটা অব্যক্ত কান্না বুকের ভেতর ঠেলে ঠেলে ওঠে। সে না পারে চীৎকার করে কাঁদতে, না পারে গভীর বেদনা কারো কাছে প্রকাশ করতে। বোবা জন্তুর মতোই সে সব নিঃশব্দে সহ্য করে। নিতাই তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে। তার বুকের পাঁজরগুলো ঝাঁজরা করে দিয়ে গেছে। নিতাই নেই ; কিন্তু তার বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তার সমস্ত শিরা-উপশিরায়, রক্তপ্রবাহে, দেহের অণুপরমাণুতে সে মিশে আছে। সে প্রাণপণে তাকে ভুলতে চায়। কিন্তু যতই ভুলতে চেষ্টা করে, ততই এসে জুড়ে বসে। জমিদারের প্রবল প্রতাপ তাকে মাটি ধরতে বাধ্য করেছে। কমলার জন্য সে মমতা বোধ করে। কিন্তু তাকে সে নিজের মনটা খুলে ধরতে পারে না। আজ কমলা কথা দিয়ে এসেছে, তাই তাকে মাটি ধরতে হয়। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সে প্রতিমার মুখটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে লয়। আবার কামকাঠি দিয়ে কোণে কোণে টান দেয়। কোণের কাছটা বুড়ো আঙুল দিয়ে মসৃণ করে। চুলের থোকায় কাম-কাঠির চিকণ আগা দিয়ে আরো কিছুটা টান দিতে থাকে। ঠোঁটের কোণটায় একটুখানি গম্ভীরতা আনে। নাকের মাথাটা সামান্য জাগিয়ে দেয়। বিড়ির প্যাকেট নিঃশেষ হয়ে আসতে থাকে। এতগুলো বিড়ি টানায় দেবুর মাথা ঝিম ঝিম করে। কপালের শিরা-উপশিরাগুলো যেন

কেমন তুরন্ত গতিতে দপ্‌ দপ্‌ করতে থাকে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে আর পারে না। একটা পুরানো জামা দিয়ে মুখটাকে ঢেকে কুপীটা নিয়ে ঘরে আসে। কেমন আচ্ছন্নের মত কিছু খেয়ে কুপীটি নিভিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে।

সোনালী আলোয় ঝলমল সুন্দর প্রভাত। কুমোর পাড়ায় ঘরে ঘরে কার্তিক গড়াবার ব্যস্ততা। কারোর এতটুকু ফুরসুত নেই। কমলা ভোর হতেই উঠে ছাঁচের কার্তিকগুলো একে একে রোদে দিয়েছে। উঠোন ঝাড় দেওয়া, বাসন-কোসন মাজার কাজ শেষ করেছে। কিন্তু দেবু এখনও ওঠেনি। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এবার কমলা ভাবল, কার্তিকখানা রোদে দেওয়া দরকার। ভালো করে না শুকোলে রং জমবে না। তু'হাতে ধরে কষ্ট করেই কার্তিকখানা এনে উঠোনের যে জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশী রোদ পড়ছে সেখানেই দাঁড় করিয়ে মুখে জড়ানো পুরোনো জামাটা খুলে ফেলে। খুলে ফেলেই চমকে ওঠে কমলা। মাগো! বলে সে আর্ত চিৎকারে বাড়ী ফাটিয়ে ফেলে। সহসা এমন আর্তচিৎকার শুনে পাশের বাড়ীর আট-দশজন ছুটে আসে। দেবু লাফ দিয়ে মাঁচার পর থেকে ঘরের মেঝেতে এবং সেখান থেকে দৌড়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। কমলা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। দেবু পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। উপস্থিত সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাশের বাড়ীর প্রৌঢ়া মহিলা বললে,—আহা! দেবু সারারাত বইস্যা ঠিক নেতাইর মুখখানা বানাইছে। কোথায়ও এট্টু অমিল নাই। সেই চোখ, সেই নাক, সেই মুখ, চুলগুলিও সেই রকম। আহা! সকালের রোদ্দুরে কেমন সুন্দরই না দেখায় মুখখনা। নেতাই যদি আজ থাকত রে। না দেবু, তুই তোর বাপ-ঠাকুদ্দার নাম রাখলি বটে। তোর হাতেও মাটি কথা কয়রে!

দেবু তবুও নীরব। কান্না শুনে যারা দৌড়ে এসেছিল, তারা সবাই একে একে চলে গেল। রাত-জাগা দেবুর কোটরগত চোখে বিন্দু বিন্দু জল ক্রমশঃ বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হল। আর কমলা এসে তু'হাত বাড়িয়ে ঠাকুরের কাঠামোটা ধরে মাটিতে কপাল ঠুকতে লাগল। ঠাকুর,

গতবছর এমন দিনে তুমি আমার বুক থ্যাইকা যখন গ্যালাই তখন আবার নিতাইর মূত্তি ধইর‍্যা আইলা ক্যান, ঠাকুর !

—৩০—

একাত্মতা

র‍্যাডক্লিফের লাল পেন্সিলের ছুরিটা তখনো জননী জন্মভূমির বুকটা চিরে দেয়নি, শুরু হয়নি তখনও পূর্ববাংলা থেকে সীমাহীন উদ্বাস্তুস্রোত। এ ১৯৪৭ সনের গোড়ার দিকের কথা। আমি তখন ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ি। মেজদা হঠাৎ কলকাতা থেকে বাড়ী গেলেন। দেশ ভাগ হবে হবে অবস্থা। কেমন একটা শংকা সকলের মনে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাগে পড়ার ভয়ে সবাই ভীত। মেজদা গিয়েই জ্যাঠামশাইকে বল্লেন, বাবা, যদি এ জায়গাটা পাকিস্তানে পড়ে, তবে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে কলকাতা নিয়ে যাবো। মেজদা কলকাতা রওনা দেবার আগে বাড়ীতে যে-চাকরটা থাকতো, তাকে নিতান্তই অনাবশ্যক বলে ছাড়িয়ে দেবার কথাও বলে এলেন।

চাকরটির নাম ছিল সুখেন। কালো কুচকুচে চেহারা, নাকটা বেশ খাড়া। লেখাপড়া জানতো না পাশের গ্রামেই বাড়ী। দারিদ্র্য তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছে, তাই এখানে হাটবাজার করা, ফুট-ফরমাস খাটা, জাল বেয়ে মাছ ধরা ইত্যাদি কাজ করে ভাতকাপড় পায়। রাতে এ বাড়ীতেই ঘুমায়, ফলে পাহারার কাজটাও হয়ে যায়। আমরা কিশোররা, বিশেষ করে আমি, ওকে খুব ভালো বাসতাম। ১৮।২০ বছরের যুবকটির সাথে আমার কেমন একটা সখ্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ওকে ছাড়িয়ে দেবার কথা শুনতেই ওর চোখমুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো।

সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম গেল ভেঙে। অনেকের সাথে আমরাও বাইরে এলাম। তখন কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের মাটির ভিতে চোরে বড় একটা সিঁদ কেটেছে। তবে লোকজন সজাগ হয়ে পড়ায় চোর পালিয়ে গেছে। কিছু নিতে পারেনি। বাড়ীর কারোরই আর বাকী রাতটুকু ঘুম হ'লো না।

তখনও বৃটিশ-রাজত্ব শেষ হয়নি। অত্যন্ত কড়া প্রশাসন। সকাল বেলায়ই থানায় চুরির এজাহার দেওয়া চাই। থানায় যাওয়ার আগে আর একবার সিঁদটার বিবরণ ঠিক করতে গিয়ে একজন আবিষ্কার করে বসলেন যে, সিঁদটা ঘরের ভেতর থেকে শাবল দিয়ে কাটা হয়েছে; বাইরে থেকে নয়। ফলে এক ভয়ানক জটিলতার সৃষ্টি হলো। আট-চালা ঘরে সভা বসলো। সুখেনকে সরাসরি একাজের জন্য অভিযুক্ত করা হলো। সেতো একেবারেই অস্বীকার করে বসলো। কিছুতেই তাকে দিয়ে স্বীকার করানো গেলো না। তখন থানায় যাওয়াই ঠিক হলো। শেষকালে কে একজন বল্লেন, পুলিশের খাতায় নাম গেলে গুষ্ঠি বরবাদ হবে। এখনই হাতে হাতকড়া আর পিঠে চাবুক পড়বে। বুঝে ছাখ।

সুখেন একটু নরম হলো। আবার সভা বসলো। সুখেন তূলার বস্তার মধ্য থেকে মাটিমাখা শাবলটা বের করে দিলো। সে কেঁদে ফেলে জানালো যে, চুরির হিড়িক পড়ে গেছে বুঝলে তাকে আর ছাড়িয়ে দেওয়া হবে না, এই ভেবেই সে সিঁদ কেটেছে। চুরি করার উদ্দেশ্য তার আদৌ ছিল না।

সবাই সুখেনের কথায় বিশ্বাস করল বটে; কিন্তু প্রচণ্ড মারধোর করা হলো এবং সেদিন সূর্যাস্তের পূর্বে তাকে ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে, এমন শপথ করিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। সবাই সুখেনকে ছি ছি করতে লাগলো। আমারও ওর পরে খুব ঘৃণা হলো। সুখেন চোর, একথা ভাবতে কেমন গা ঘিন ঘিন করে উঠলো।

....

কিছুদিন পরেই এলো স্বাধীনতা, এলো পাকিস্তান। গ্রামের প্রায় সবাই দেশ ত্যাগ করলো। আমি কিন্তু রয়ে গেলাম ভিটেমাটি আঁকড়ে। দেখতে দেখতে দু'টি যুগ পার হয়ে গেল। শেষে বানের জলে ভেসে-আসা খড়কুটোর মত আমাকেও একদিন পাড়ি দিতে হলো। তারপর কত লাঞ্ছনাইতো মাথার ওপর দিয়ে গেল। কোথাও কোন জীবিকার সন্ধান করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত এক বন্ধুর সহযোগিতায় কলকাতার উপকণ্ঠে এক সাবানের কারখানায় একটি কাজ পেলাম।

বলাবাহুল্য, এটি নিতান্তই মজুরের কাজ। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকায় চালিয়ে যাই। কষ্ট খুবই হয়। তবু নিরুপায় আমি। বেতন যা পাই তাতে কোন রকমে টিকে থাকি, এই পর্যন্ত।

কারখানায় পুরানো কর্মী শরৎ—বয়স প্রায় পঞ্চাশ—আমাকে কাজ শিখিয়েছে। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসে, খবরাখবর জিজ্ঞেস করে। ক্রমে তার সঙ্গে বেশ মিশে গেলাম। আমার বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-পরিজন সম্পর্কেও জানতে চায়। খুব কৌতূহল ওর এসব জানার জন্য।

একদিন বল্লাম, শরৎদা, তোমার বাড়ী ছিল কোন জিলায়?

—আমার বাড়ীতো এখানেই, জয়নগর।

—ও! তুমি পূর্ববাংলার লোক নও?

—না না। শুনেছি ওদেশে আমার মামাবাড়ী ছিলো। তবে যাইনি কোনদিনও। ওখানে নাকি খুব মাছ পাওয়া যায়।

—এককালে পাওয়া যেত খুবই, এখন আর তেমন পাওয়া যায় না।

এমনি করে দু'জনে গল্প জমে ওঠে।

... ...

বছর তিনেক কেটে গেল কারখানার কাজে। ভূতের মতো খাটি। ওভারটাইম করি। কখনো কখনো বা চাকরীরও চেষ্টা করি। কতো বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে ধরলাম। কতো জায়গায় ইন্টারভিউ দিলাম। কিন্তু কিছুই হলো না। এমনকি দ্বিতীয় কোন টুকিটাকি

কাজও জুটাতে পারলাম না। অনেক সাবান উৎপন্ন হলো, অনেক ময়লা পরিষ্কারও হলো জগতের। অথচ আমার ময়লা পরিষ্কারের কোন ব্যবস্থাই হলো না। ছোট একখানা ঘর ভাড়া করে তার মধ্যে জন্তুর মতো থাকি। জীবনটাকে তিলে তিলে শুকিয়ে নিঃশেষ করে আনি। ক্রমশ আমার পৃথিবীটা ছোট হতে হতে কারখানাটা আর বাসাটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। আমার ভেতরে শ্রমিকটুকু ছাড়া আর সবই শেষ হয়ে গেল। অতীত ভুলে গেলাম, ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছেড়ে দিলাম।

... ...

সেদিন কারখানায় গিয়ে সবেমাত্র কাজ শুরু করেছি, এমন সময় আপিসে ডাক পড়লো। মালিক, তথা ম্যানেজারের টেবীলের সামনে গিয়ে সেলাম দিয়ে দাঁড়ালাম। মালিককে বেশ গম্ভীর মনে হলো। তিনি বল্লেন—

—শোন শংকর! তোমার আর এখানে কাজ করা হবে না।

—কেন স্যার?

—তোমার এসব নোংরা কাজে পোষাবে না।

—সে কি? আমি সব জেনেইতো কাজে ঢুকেছি?

—না না। এসব নোংরা কাজ। তাছাড়া তুমি আমার শ্রমিকদের মধ্যে contaminated philosophy ছড়াও। ওরা একদিন শ্লোগান দিয়ে উঠবে। তাই তোমাকে যেতেই হবে।

—না না, স্যার! আমি কাজ ছাড়বো না। আমি খাবো কি? আমার অন্য কোন উপায় নেই।

—কিন্তু তোমাকে যে যেতেই হবে।

কেন স্যার?

—শংকর।

মালিক এমন কঠোর কণ্ঠে নামটা উচ্চারণ করলেন এবং এমন কুটিল দৃষ্টিতে তাকালেন যে, আমার দস্তুর মতো ভয় হলো। আমি আমতা আমতা করে আমার দুর্দশা ও অসহায়তার কথা তাকে বোঝাতে চেষ্টা

করলাম। তিনি কিন্তু সিদ্ধান্তে অনড়ই রইলেন।
বল্লেন—

শংকর! তোমাকে আমি কাজে নিতে চাইনি। তবু কাকুতি-মিনতি করে ঢুকেছ। ঢুকেই ছ'মাস পরে অন্য রকম হয়ে গেছ। তখন থেকেই তোমার সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করি। গতকাল আমার সে-কাজ শেষ হয়েছে।

—আমার সম্পর্কে অনুসন্ধান!

—হ্যাঁ! অবাক হচ্ছো নাকি?

—আমার সম্পর্কে অনুসন্ধানের কি থাকতে পারে?

—তুমি VIII পাশ বলে এখানে ঢুকেছো। মনে পড়ে তো?

—হ্যাঁ! পড়ে।

—কিন্তু তুমিতো একজন গ্র্যাজুয়েট। এবং তোমার career'ও তো খারাপ না। কাজেই এখানে তোমার কাজ চলে না।

—স্যার! আমার সরকারী চাকরীর বয়স নেই।

—অন্য sector-এ চেষ্টা করো।

—স্যার, আমার জন্য কোন sector ই খোলা নেই।

—না, এখানে আর হবে না।

বলেই একটা টাইপ-করা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—

সই করো।

—স্যার! এতো রেজিগনেশন লেটার!

—আর কোন কথা নয়। যদি রেজিগনেশন না দাও, তবে তোমার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস হবে। তুমি facts supress করেছো।

—স্যার, আমাদের জীবনের বহু fact ইতো suppress করতে হয়। Fact গুলো যদি unearthed হয়, তবে কী জীবন চলে?

—তুমি আমাকে জ্ঞান দেবে না, শংকর। নাও, সই করো। আর মাস শেষ হলে এমাসের যে-ক'দিন কাজ হয়েছে তার বেতনটা এসে নিয়ে যেও।

—স্যার! দয়া করুন, স্যার!

—তুমি সই করো। না হয় তোমাকে পুলিশে দেবো। নাও, সই করো।

—আর একবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালাম। তারপর কম্পিত হস্তে একটা সই করলাম।

—যাও। এবার আর একটা কাজ জুটিয়ে নাও গিয়ে।

নিরুত্তর আমি ওর মুখের দিকে একবার তাকালাম। ওর টেবীলের ওপর বড় বড় দু'টো পেপার ওয়েটের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মালিক হয়ত কিছু উদ্ধার করেছে। কলিং বেল টিপলেন। আর্দালি এলো।

—শরৎকে ডাকো।

শরৎ এলো।

—শরৎ! শঙ্কর রেজিগনেশন দিয়েছে। ওকে একটু বাইরে দিয়ে এসো।

শরৎ শ্রমিক-নেতা। সে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। ওর মুখটা কেমন কঠিন হয়ে গেল। কি যেন বলতে গিয়ে বিড়বিড় করে উঠলো।

—কি বল্লাম, শরৎ?

শরৎ—চলো শংকর। বাইরে চলো।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি। মাথা ঘুরছে। সমস্ত বাড়ীটা কেমন যেন টালমাটাল মনে হচ্ছে। এত বড় বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আত্ম-সংবরণ করা যে কি কঠিন তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না।

রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিছু সময় ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অজস্র চিন্তা তালগোল পাকাচ্ছিল মাথার মধ্যে। ভাবলাম, একটা ডিনামাইট পেলে আপিসটা সহ গোটা কারখানাটাই উড়িয়ে দিতাম। আবার মনে হলো না না; আর কারোর তো দোষ নেই। একটা অস্ত্র পেলে ঐ হিংস্র জন্তুটাকে একেবারে শট্ ডাউন করে দিতাম।

আস্তে আস্তে সম্বিত ফিরে আসতে লাগলো, পুত্রহারা পিতারও যেমন

ফিরে আসে। যার ঘরে বউ ছেলেমেয়ে আছে, তার পক্ষে এসব চিন্তা করে লাভ কী? যদি পেছনে লেজুড় না থাকতো, তা' হলে আজ হয়তো একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলতাম।

দেশ গেছে, ঘরবাড়ী গেছে, ঐতিহ্য গেছে, আজ চাকরীটাও গেল। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, সব শেষ।

... ...

শেয়ালদায় বনগাঁগামী লাষ্ট ট্রেনে যখন বসলাম তখন আমার শরীর একেবারে অবসন্ন। সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে খোলা জানলা পথে চেয়ে আছি। কিন্তু চোখ কিছুই দেখছে না। যেন আমি শ্মশান থেকে কোন ঘনিষ্ঠ কাউকে দাহ করে ফিরছি। কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ট্রেনটা যখন ছাড়ল তখন একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে উঠল, দেখলাম। সে এসেই আমার কাছে সামনা সামনি বসে পড়ল। আমি পা দু'টো নামিয়ে নিলাম।

—এ কী! তুমি! শরৎ দা!

—হুঁ। আমি!

—তুমি বনগাঁর ট্রেনে কেন?

—তোমাকে বাসায় পৌছে দেব বলে।

—সে কী?

—সত্যি তাই।

—না না। সারাদিনইতো আমি একা ছিলাম। কতরাজ্য ঘুরলাম। কই, আমার সঙ্গে তো কাউকে লাগেনি।

—তুমি জানোনা। আমি সব সময়ই তোমার কাছাকাছি ছিলাম। তুমি যাওয়ার পরপরই আমি ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

ইডেন গার্ডেন, এসপ্লানেড, রবীন্দ্রসদন, হাওড়ার ব্রিজ, সব জায়গায়ই আমি ছিলাম। তবে ঐ ব্রিজের পরেই তোমার খুব কাছাকাছি পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। বারবারই মনে হচ্ছিলো, লাফ দিয়ে বস নাকি।

—সারাদিন আমার পেছনে ঘুরলে কেন ?

—কেন'র জবাব দিতে পারব না। তবে প্রাণে চাইল, তাই।

—এত রাতে তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ। তোমাকে রাখতে পারি এমন একটু জায়গাও আমার নেই।

—ওসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি স্টেশনেই ফিরে আসবো। তারপর শেষরাতের ফার্ষ্ট ট্রেনে চলে আসা যাবে।

—তুমি এসব করতে গেলে কেন ?

—আবার সেই প্রশ্ন ? জানো না, আজ আমি কতো ব্যথা পেয়েছি।

—না, আমি ভেবে পাচ্ছি না কিছুই।

—শংকর, একবার ভাল করে চেয়ে দেখোতো, আমাকে চিনতে পারো কি না ?

—এ আবার কি প্রশ্ন ? তুমিতো আমাদের শরৎ দা।

—আচ্ছা শংকর ! তোমার জ্যাঠামশাইর ঘরে এট্টা চাকর ছিল। মনে পড়ে ?

এ কী ! এ যে একেবারে পূর্ববাংলার, ঠিক আমাদের অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি। ব্যাপার কী ! আমি ওর মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকলাম। কিন্তু কিছুতো নতুন আবিষ্কার করতে পাচ্ছি না।

—তুমি তখন ছোট। নীচের ক্লাশে পড়ো।

একবার তোমার জ্যাঠার ঘরে চোরে সিং কাট্‌ছিলো। মনে পড়ে ?

আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। সেই নাক ! সেই রং। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমি কি সুখেন দা ?

—হুঁ ! তা হলে চিনতে পারলে ?

—তাহলে এখানে যে তোমার নাম শরৎ। পূর্ববাংলাকে একেবারে চেপে যাও যে ?

—অতীত চাইপকা রাখতে চাই। তাই নামটাও চাইপকা গেছি। তোমারে কিন্তু আমি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ঠিক পাইছিলাম।

—তাহলে সুখেন দা, তুমিই কি আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরিটা করেছো ? ওরা কি করে জানলো যে, আমি গ্র্যাজুয়েট ?

ছি ছি ! শংকর ! তুমি এসব ভাবতে পারলে ?

ওর মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। তারপরই ভারাক্রান্ত হলো।

—গ্যাখো শংকর, তোমাদের সঙ্গে ঐখানেই আমাদের পার্থক্য। তোমরা, অর্থাৎ তুমি যে-ঘরের ছেলে সেই ঘরের লোকেরা, আমাদের যে কত নীচ ভাবো ! আর ব্যবহারটাও করো তাই বিড়াল কুকুরের মতো। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, কি লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে একদিন আমার গ্যাশ ছাড়তে হইছিল। সেদিন তোমরা কেউ আমার জন্য দুঃখ পাও নাই। কিন্তু আইজ তোমার সাথে মালিক যে-ব্যবহার করছে, আমি তার খুব প্রিয় পাত্তর, তবু এটা সহ্য করতে পারি নাই। তাই তোমার পিছু নিছিলাম। তোমার দুঃখের কথা আমি বুঝি। তোমাকে তো আমি ভালোবাসি। তাছাড়া তুমি আর আমিতো আইজ একই। তাহলে তোমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করবো কেন ? আমি তো আর তোমাগো মতো ভদ্দরলোক না।

যে-ই করুক, চাকরীটাতো গেলো। এখন সামনে মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—তুমি একেবারে হাল ছাইড়গা দিও না। এট্টা কিছু হবেই। উপায় এট্টা বাইর করবোই।

আর কি হবে ? কোন পথই দেখছি না।

ট্রেন ছুটে চলে। নিস্তব্ধ রাত্রি। বাইরে নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। একটা নিশাচর পাখিও চোখে পড়ে না। সুখেনের মুখটা খুব ম্লান হয়ে আসে।

কী চমৎকার ! চাকুরী যাওয়ায় একদিন সুখেন তুলে নিয়েছিল শাবল। আর আজ চাকরী খোয়ালে আমি খুঁজছিলাম ডিনামাইট বা আগ্নেয়াস্ত্র। মুমূর্ষের হাসির মতো আমিও একটু হাসলাম। বল্লাম—

—সুখেন দা চাকরীটা গেলেও এত বছর পরে তোমাকে পেয়ে সত্যি

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। ইস্! সেই দিনগুলি মনে পড়ছে। সেই জাল বেয়ে মাছ ধরা। আরও কত কি।

—আমার চোখের সামনে দিয়ে তোমার চাকরীটা গেল। কিছু করতে পাল্লাম না।

—তা আর কি করবে তুমি ?

চাকরী হারানোর বেদনা, সুখেনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ, দু'টো ব্যাপার মিলে কেমন যেন হয়ে গেলাম। আমার চোখে জল এসে গেলো। অশ্রু গোপন করার জন্য বল্লাম—

—সুখেন দা! আমাদের পুকুরে ছোট বেলায় তুমি সাঁতার শেখাতে আমাকে, মনে পড়ে ?

সুখেন আমার চোখে জল দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বল্লো—

—সাঁতার তোমারে একদিন শিখাইছিলাম। আইজ আবার এই ভীষণ সমুদ্দুরেও তোমারে লইয়া সাঁতার দেবো। পার আমরা হবোই। কেউ ঠেকাইতে পারবে না। আমাগোতো কিছু নাই। আমাগো আর ভয় কিসের ?

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ওর মুখে একটা কঠিন আত্ম-প্রত্যয় প্রত্যক্ষ করলাম।

ট্রেন পরবর্তী স্টেশনের কাছে এসে ক্রমে গতি শ্লথ করে দিলো। খোলা জানলাপথে আকাশের নক্ষত্রগুলোকে উজ্জ্বলতর মনে হলো।

—ঃ—

ঃ হাঁদা পুরুত ঃ

এই যে তিনু কাকা, বাড়ীতেই আছেন দেখছি।

—হ্যাঁ, বাড়ীতেই আছি। তুই কখন এলি ?

—কালকে কলেজ ছুটি হয়েছে। রাত্তিরেই রওনা দিয়েছি। ঘণ্টা খানেক আগে বাড়ী পৌঁছেছি।

—তা বাড়ীতে পা দিয়েই আমার কাছে ছুটে এসেছিস ? তা বোস বোস, শরীরটরির ভাল আছে তো ?

—ভালই আছি কাকা। বাড়ীতে এলেই আপনার সাথে দেখা না হলে ভাল লাগে না।

—কি যে বলিস। আমি অবশ্য তোকে খুবই স্নেহ করি। কিন্তু তোর জন্য তো কিছু করতে পারি না, নতু। তুই যেভাবে কষ্ট করে পড়াশুনা করিস এবং পরীক্ষায় যে ভাল ফল করিস, এতে যে আমি কি আনন্দ পাই, তা তোকে কেমন করে বোঝাবো ?

—আপনি স্নেহ করেন, এতে যে কি আনন্দ পাই, তাতো আমিই কেবল জানি। আর সে জন্যইতো আপনার কাছে ছুটে না এসে পারিনা।

চৈত্রের প্রথম ভাগ। বেশ গরম পড়ে গেছে। বেলা পড়ে আসছে। পড়ন্ত বেলায় উঠোনের একপাশে তিনু বামুন একটা ভোঁতা দা দিয়ে কয়েকদিন আগের আগাম কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ভেঙ্গেপড়া একখানা আমের ডালকে জ্বালানী কাঠে রূপান্তরিত করার জন্য ছোট ছোট খণ্ড করছিল। আমি ঠিক সেই সময়ই সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো মাথায় নিলাম। এ দরিদ্র ব্রাহ্মণটির বড় পরিবার; কিন্তু আয় অতি সামান্য। যজমানি-ই এর পেশা। কিন্তু সাদা-সিধে মানুষ হওয়ায় এবং যজমানের কাছে চাইতে না পারায়, যজমানরা সে সুযোগটা নেয়। একে দিয়ে কাজ করায়

সব চেয়ে বেশী, দেয় সবচেয়ে কম। কাজেই এর না ঘোচে অভাব, না আসে সমাজে প্রতিষ্ঠা। লোকে অসাক্ষাতে একে উপহাস করে। সাধারণের ধারনা, এ ভাল করে পূজো-আচ্ছা করতে জানে জানে না। তাই একে অনেকে "হাঁদা পুরুত" বলে। কিন্তু এই নিরীহ মানুষটি কোন দিন কারো ওপরে রাগ করল না, অভিমান জানালো না। কারোর বিরুদ্ধে যেন এর কোন নালিশও নেই। আমার কেন যে এর প্রতি শ্রদ্ধা তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। বাড়ীতে থাকলে সুযোগ পেলেই ছুটে আসি আর কলেজ ছুটি হলে, অর্থাৎ একটু বন্ধ পেলেই যখন গ্রামে ফিরি, তিনু কাকার সাথেই প্রথম দেখা না করলে, একটা, দারুণ অস্বস্তি বোধ করি।

—আশীর্বাদ করি, তুই জীবনে বড় হ। তবে দ্যাখ, একটা কাজ তোকে বারণ করে যাই। সেটা হোল, কোন দিন ফুল-বেলপাতা ধরবি না, একাজ মানুষকে বড্ড ছোট্ট করে দেয়রে।

—কেন কাকা?

—কেন? আমি যা পারি তা তোরা পারবি না। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই বুঝেছি, আমি যাকে সত্য বলে মনে করি, অনেকেই তাকে মেকী মনে করে। এখানেই তোদের সংগে মানুষের সংঘর্ষ বাধবে। তাছাড়া একাজটা প্রবৃত্তিকে নীচের দিকে নিয়ে যায়।

—কী রকম?

—এইতো দ্যাখ, আমি পূজো করি। যার হয়ে পূজো করছি, মনে প্রাণেই তার মঙ্গল, তার কল্যাণ কামনা করি। দেবতার পায়ে বারবার মাথা ঠুকেই সে কথাটাই দেবতাকে জানাই। আমি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কোন রকমে ফুল-বেলপাতা ছিটিয়ে চলে আসতে পারি না। দায়সারা কাজ কোন দিন মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারিনেরে, নতু,। পূজোয় আমাকে কে কি দিল, সে নিয়ে আমি কোন দিন মাথা ঘামাই নি।

—কিন্তু আপনার তো বেঁচে থাকার, সংসার চালানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। এটা যজমানরা যদি বিবেচনা না করে, তা হলেই বা চলবে

কি করে ?

—সে কথা ঠিক। কিন্তু নতু, দক্ষিণার হিসেবে পূজোর সাত্ত্বিকতা—একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। দেবতার করুণা নৈবেদ্যের ওজনে আসে নারে, নতু। যখনই আমাকে কোথাও পূজোয় বসায় তখনই যে আমি মনে প্রাণে ধরে নেই, আমি ওদের প্রতিনিধি, ও যে আমার ওপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আমিতো ধর্মের নামে দায়িত্ব পালনে বাঁধা পড়ে গেছি।

গোধূলি নামতে আর বড় বাকী নেই। একটি শান্ত চৈত্রের গোধূলি আসন্ন। বাংলার এই ক্ষুদ্র পল্লীর প্রান্তে একটি কুটিরের প্রাঙ্গণে একটি দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের মুখে একী কথা! আমি একবার তিনু কাকার মুখের দিকে তাকালাম। ও মুখে একটি অনাবিল প্রশান্তি। দারিদ্র্য তাঁকে শীর্ণ করেছে, কিন্তু ম্লানিমা তাকে স্পর্শ করেনি। কোন গ্লানি তাঁকে ছুঁতে সাহস পায়নি। তিনু কাকা কটাকট শব্দে ডালগুলো কাটছেন। আমি অদূরে একখণ্ড ডালের ওপরে চুপ করে বসে শুনছি তাঁর কথাগুলো।

দিন চারেক পরের কথা। আজ বাসন্তী পূজোর মহা অষ্টমী তিথি। আমাদের পাশাপাশি তিন চারখানা গ্রামে সব মিলিয়ে দশবারখানা বাসন্তী পূজো হচ্ছে। আমি বেশ কয়েকখানা পূজো মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে শেষ বেলায় রায়দের বাড়ীর পথে যখন পা দিলাম, তখন উত্তর আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে কাল বৈশাখীর ভয়ঙ্কর আভাস সদর্পে ঘোষণা করছে। আমি দ্রুত পা' চালিয়ে দিলাম। কিন্তু মণ্ডপে পৌঁছাবার আগেই ধূলোর ঝড় শুরু হয়ে গেল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যখন রায়দের আটচালায় এসে পৌঁছালাম, তখন বাতাস থেমে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ আবহাওয়াটা এমন হয়েছে, যাতে করে চৈত্র না আষাঢ় বুঝে ওঠা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মণ্ডপে তিনু কাকা একা একা বসে নির্বিকার চিত্তে চণ্ডীপাঠ করছেন। আটচালায় এক কোণে বৃদ্ধ ঢাকী গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। তৃতীয় কোন ব্যক্তি ওখানে উপস্থিত নেই। সব লোক ভেতর বাড়ীতে। সেখানে ছোটোখাটো একটা নিমন্ত্রণ পর্ব চলছে। আমি ধীরে ধীরে মণ্ডপের বারান্দায় মেঝেতে গিয়ে চুপটি করে

বসে পড়লাম। তিনু কাকা পাঠ করছেন, আমি নীরব শ্রোতা। দেবী মহামায়া সকল দেবতার তিল তিল শক্তিতে অমিত তেজস্বিনী। তিনি অসুর বিনাশের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের অশুভ মহাশক্তিকে বিনাশ করার জন্য শুভ মহাশক্তিধারিণী মহাদেবীর আবির্ভাব। তিনু কাকা আমার নীরব উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু কিছুই বলেন নি। বাইরে অশ্রান্ত বর্ষণ। সম্মুখে দশভুজা দুর্গার সঙ্গী সঙ্গিনী সহ মনোরম মূর্তি। বিবিধ উপচারে সুসজ্জিত মণ্ডপ। দেবী মহামায়া অসুর বিনাশে করেছেন যুদ্ধযাত্রা। আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি, আপন সত্তা সব ঐ মহা-শক্তির পদতলে কেমন যেন লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। তিনু কাকার গলা শুকিয়ে আসছিল। তাই কোষা থেকে কুষি দিয়ে একটুখানি জলতুলে হাঁ করে গলার মধ্যে দিলেন নিতান্তই শুকিয়ে-আসা গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে।

—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, তিনুকাকা ?

—কষ্টতো একটু হয়ই।

—এর পরে তো আবার অনেক রাতে সন্ধি পূজো ?

—হ্যাঁ, রাত দুটো ছাব্বিশ মিনিটে।

—আপনার তো খেতে খেতে ভোর হয়ে আসবে।

—কী আর করি। তবে তোরা যত কষ্ট মনে করিস, এই মায়ের সামনে বসলে অত কষ্ট ঠিক লাগে না।

—আচ্ছা কাকা, একটা কথা বলব ? কিছু মনে করবেন নাতো ?

—না না বল, কি আবার মনে করব ?

—আজকে তো আপনার অনেক খাটনি। সকাল থেকে মহাষ্টমীর পূজো করছেন। এখন চণ্ডীপাঠ করছেন। সেই মাঝরাত ছাড়িয়ে আবার সন্ধি পূজো। একটানা এত বড় উপোস। তা চণ্ডী যদি একটু সংক্ষেপে পাঠ করে কিছুটা ঘুমিয়ে নিতেন।

তিনু কাকা সূতোয় আঁটা চশমার মধ্য দিয়ে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকালেন। আমি কেমন একটু দমে গেলাম। না, ওই আমি বলছিলাম কি, এ্যা—এ্যাখন তো কেউ এখানে নেই। এখন যদি

দু'চারটা অধ্যায় ছেড়েই দেন, তাহলে তো আর কেউ তা দেখতে আসছে না। তাই বলছিলাম, একটু বিশ্রাম করে নিতে পারতেন।

চশমাটা চোখ থেকে খুলে তিনু কাকা আর একটু গঙ্গা জল মুখের মধ্যে দিলেন। এবার একটুখানি হাসলেন। বললেন, দ্যাখ নতু, তোর কথায় আমি রাগ করছি না। তুই বলছিস, কেউ তো আর দেখতে পাবে না। কিন্তু একটা কথার জবাব দিতে পারিস, ফাঁকি দেব কাকে?

তিনু কাকা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকালেন। আমি লজ্জিত বোধ করলাম। তিনি আবার চশমা এঁটে চণ্ডীপাঠ শুরু করলেন। আমি না পারলাম উঠে আসতে, না পারলাম স্বাভাবিকভাবে বসে থাকতে। তিনু কাকার প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আমার সমস্ত মনের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, ফাঁকি দেব কাকে?

মাস চারপাঁচ একটানা কলেজ করে পূজোর বন্ধে আবার এলাম। ঘরে ঘরে শারদোৎসবের আয়োজন। কিন্তু আমার বিধবা মায়ের একটিমাত্র সন্তানের জন্য কোন আয়োজনই সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এজন্য মায়ের কষ্ট যতই থাকুক না কেন, আমি নিজে তেমন কোন কষ্ট বোধ করছি বলে মনেই হয় না। কিন্তু খান তিনেক বই আমার না কিনলে যে হবেই না। কিন্তু কোন রকমেই গোটা পনের টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামে যারা সুদে টাকা খাটান, তারাও নিঃস্ব বিধবার পুত্রকে বই কেনার জন্য টাকা ধার দেবেন না। সেখানে আবেদন জানানো বৃথা। মা বললেন, দ্যাখ, যদি কোন জায়গা থেকে ধার করতে পারিস, তাহলে বড় পুকুরের মাছ যখন পৌষ মাসে বিক্রি হবে, তখন পনের টাকার অন্ততঃ গোটা দশেক টাকা হবেই। আর পাঁচ টাকার যা হোক একটা বাবস্থা করা যাবে। কিন্তু আমি এমন কোন লোককেই দেখতে পেলাম না, যার কাছ থেকে পনের টাকা ধার পাওয়া সম্ভব। খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই হাঁটতে হাঁটতে তিনু কাকার বাড়ীতে এসে পৌঁছালাম। উনি বারান্দায় বসে হিসেব লিখছেন। পূজো এবং লক্ষ্মীপূজোয় কোন্ জায়গায় কী পেয়েছেন, তা লিখে

রাখছেন। আমি গিয়েই বারান্দার এক পাশে একখানা পিঁড়ি টেনে বসে পড়লাম।

—তোর মুখটা অমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেনরে নতু ?

—কই, না তো ?

—গ্যাখ, আমাকে লুকোবি না। কি হয়েছে ? বল না। কেন যেন লুকোবার ইচ্ছেও হচ্ছিল না। সব বলেই ফেললাম। তিনু কাকা জমা-খরচের খাতা ও কলম নিয়ে ঘরের মধ্যে উঠে গেলেন। একটু পরে একটা মাটির ঘট এনে বারান্দার মেঝেতে উপুড় করে ধরলেন। আনি, দোয়ানি, সিকি, আধুলিগুলো ছড়িয়ে পড়ল। উনি গুণে গুণে থরে থরে সাজিয়ে বললেন, সতের টাকা দশ আনা আছে। তুই পনের টাকা নিয়ে যা।

—তিনু কাকা !

—তুই ভাবছিস, আমার সংসার কি করে চলবে ? আমার সংসার এমনিতেই চলে না। এই পনের টাকায় যে আমার স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে, তা-ও নয়। কিন্তু পনর টাকার জন্য তোর বই কেনা হবে না, এ ভাবতে আমার দারুণ কষ্ট লাগে। তুই টাকা নিয়ে যা। বই কেন। ভাল করে পড়াশুনা কর। তোর যেদিন ভাল ফল হবে, সেদিনই আমি সবচেয়ে খুশী হব। তোকে তো আর আমি দান করছি না। দান করে তোকে আমি ছোটও করতে চাই না। যবে পারবি, তবে আমার টাকা দিয়ে দিবি। আমি দু'-একবার আমতা আমতা করলাম। কিন্তু তিনু কাকা কোন কথাই শুনলেন না। পনের টাকা আমাকে ধার আনতেই হল। পৌষ মাসের মাঝামাঝি আমাদের বড় পুকুরের মাছ বিক্রি হল। অনেক বছর পরে এ বছরই প্রথম জেলেরা পনের টাকা দাম দিয়েছে। টাকা পেয়েই মা বললেন, নতু, তোর তিনু কাকাকে টাকাটা দিয়ে আয়। আমি টাকা নিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, মা পিছু ডাকলেন, বললেন, নতু, তিন মাস টাকাটা পড়ে রয়েছে। অন্য জায়গা থেকে টাকা আনলেতো তোকে সুদ দিতেই হোত, তবে এখানে ঠিক সুদ হিসেবে নয়, তোর কাকার ছেলে-মেয়েদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য আর এই দুটো টাকা

নিয়ে যা। বলবি, মা দিয়েছেন। আমার বাধো বাধো ঠেকলেও টাকা দুটো সঙ্গে নিলাম। গিয়ে দেখলাম সবেমাত্র কোথেকে যেন একটা কি পূজো শেষ করে তিনু কাকা বাড়ী ফিরেছেন। ছেলেমেয়েরা কাড়াকাড়ি করে চালকলা ইত্যাদি খাচ্ছে। আমি যেতেই তিনু কাকা চিৎকার করে বললেন, তোরা অমন করে খাচ্ছিস কেন? দে-দে, নতুকে একটু পাটালি গুড় দে।

—না না। আমি আবার কি পাটালি গুড় খাব? ও বাচ্চারা খাক।

—তুই কি বড় হয়ে গেছিস নাকি?

—না, তা নয়।

পাটালি গুড় আমাকে খেতেই হল। আমি খেতে খেতে বললাম, তিনু কাকা, আমাদের বড় পুকুরের মাছ বিক্রি হয়েছে। মা আপনার টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেই টাকাটা তাঁর সামনেই রাখলাম। তিনু কাকা গুনে পনেরটা টাকা নয়ে ঘরের মধ্য গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এসে অবশিষ্ট দুটো টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

আমি বিনীতভাবে বললাম, কাকা, মা দিয়েছেন।

—অর্থাৎ সুদ।

—না, না, না। সুদ নয়, সুদ নয়।

—তবে কি?

—পনের টাকা নিয়ে সতের টাকা দিলে, দু'টাকা সুদ হয় না, কি হয়?

—মা পাঠিয়েছেন বাচ্চাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য।

—তোর মাকে বলিস, সংসারে অনেক আসলই তো পেলাম না, সুদ নিয়ে কি আর পেট ভরবে?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকা দুটো নিয়ে আমাকে ঘরে ফিরতে হল। পথে বারবার তিনু কাকার কথাটা ঘুরে ফিরে মনে আসতে লাগল, সংসারে অনেক আসলই তো পেলাম না, সুদ নিয়ে কি আর পেট ভরবে?

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। কলেজে পরীক্ষা পর্ব শেষ

করে বাড়ীতেই পড়ে আছি। অভাব অনটন, মায়ের দুঃখ, নৈরাশ্য আর অজ্ঞাত ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়েই দিন কাটে। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। গ্রামে আমার একমাত্র বন্ধু সুজিৎ। সে-ও আমারই মতো বিধবার একমাত্র ছেলে। আমারই সঙ্গে পড়াশুনা করত। কিন্তু দারিদ্র্য তাকে বেশী দূর এগোতে দেয়নি। স্কুলের শেষের দিকটায় এসে সে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সামান্য একটু চাষের জমি আছে। তার চাষ এবং পাশের গ্রামে একটি পাঠশালা খুলে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছে। আবার পড়াশুনা করবে এমন একটা দুর্নিবার স্বপ্ন তার মন থেকে আজও মুছে যায়নি। কিন্তু আজ দুপুরে মা অর্থাৎ বিশ্ব-সংসারে তার একমাত্র অবলম্বন, মারা গেছেন। সংবাদ পেয়ে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি উঠানে শব শায়িত।

সুজিৎ চুপ করে মায়ের পায়ের কাছে বসে আছে। দু'চারজন কৌতূহলী লোক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। ওকে ওই অবস্থায় দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ বাঁধভাঙা স্রোতের মত বেরিয়ে এল। মনে হল, বিধাতা সুজিৎকে আজ কিরকম অসহায় করে দিলেন। আর একটা ছবি আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল। আহা, আমাকেও তো একদিন এমনি করে মায়ের পায়ের কাছে বসে থাকতে হবে। সুজিতের পাশে বসে আমি হাউমাউ করে কাঁদছি। কিন্তু সে নির্বিকার বসে আছে। আমার কান্নার বেগ স্তিমিত হয়ে এলে, খুব ক্ষীণ অথচ শান্ত কণ্ঠে সুজিৎ বললে, নন্তু, একটা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। মা তো চলে গেল, পয়সা-কড়ি বলতে ঘরে কিছুই নেই। তাছাড়া পাড়ায় খবর দিয়েছিলাম। কেউ শব-দাহ করতে আসবে না। এখন তুই-ই আমার ভরসা।

—আসবে না কেন ?

—মায়ের শবের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—প্রায়শ্চিত্ত কেন ?

—মার নাকি পাপ আছে।

—কি রকম ?

—মা তো বালবিধবা।

—অর্থাৎ—

—অর্থাৎ, মায়ের সতের বছর বয়সে আমার জন্ম। আমার জন্মের পরপরই মা বিধবা হন। আজ সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মা চলে গেলেন। কাজেই মায়ের যৌবনটা বৈধব্য নিয়েই কেটেছে। এ অবস্থায় নাকি পাপ স্পর্শ না করেই পারে না। তাই শবের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—না করলে ?

—না করলে কেউ দাহ করতে আসবে না। আমার মায়ের মৃতদেহের সৎকার হবে না।

—নবীন জ্যাঠাকে খবর দিয়েছিলি ?

—দিয়েছিলাম।

—তিনি কি বলেছেন ?

—তিনিই বিধান দিয়েছেন। কাজেই প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া শব দাহ হবে না।

—এটা অন্যায় ? এটা জুলুম। এ অসহ্য।

—কি করি বল ? আমি তো শব ছেড়ে উঠতেও পারছি না। আর নবীন জ্যাঠা যখন বলেছেন তখন প্রায়শ্চিত্ত না করলে কেউ আসবেও না। তুই কি বলিস, নতু ?

—তুই কি ভেবেছিস, সুজিৎ ?

—তুইতো আমার মাকে জানিস।

—জানি মানে ? তোর পরে তোর মাকে আমার চেয়ে বেশী বোধ হয় আর কেউ জানে না। এমন সতী-সাধ্বী রমনী দেহরক্ষা করেছেন। দেবীর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। তার মৃত-দেহের প্রায়শ্চিত্ত ! এটা মাথা পেতে নিতেই হবে ? পাপ যাকে দেখে ভয় পেত, যিনি ছিলেন সবার জননী, তাঁর মৃত দেহের লাঞ্ছনা ; এ সইতে বড্ড কষ্ট হয় সুজিৎ। অবশ্য তুই তার ছেলে। এ ব্যাপারে তোর সিদ্ধান্তই আমি চূড়ান্ত বলে মেনে নেব। তুই বল, কি করতে চাস ?

—সুজিৎ, আমার মা নিষ্পাপ। তার মৃতদেহের প্রায়শ্চিত্ত হলে প্রকারান্তরে তাঁর পাপকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। একজন নিষ্পাপ নারীর মাথায় বিনে কারণে পাপের বোঝা চাপিয়ে দেব? পুত্র হয়ে আমি তা কি করে পারি, বলতো?

—আমিও তাই ভাবছি।

—প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না। তাতে যদি দারুণ কিছুও ঘটে, সেটাও আমি মেনে নেব। তবে তুই একবার পাড়ায় যা। মাথায় যখন বিপদ চেপেছে, তখন সবাইকে অনুরোধ করতেই হবে।

—ঠিক আছে, আমি যাই। দেখি, কতটা কি করা যায়।

আমি পাড়ার ভেতরে পাড়া দিয়েই আঁচ করতে পারলাম, সুজিতের মায়ের শবদাহ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন নৈবচ নৈবচ। তবু আমি মাধব খুড়ো, অশ্বিনী চাটুজ্জে, নীলরতন কাকা, দেবেন চক্রবর্ত্তী, জিতেন দা, সবার বাড়ী একে একে গেলাম। সবাই আমাকে জানালেন, নবীন জ্যাঠার হুকুম না হলে কেউ যেতে পারবেন না। আমি নিরুপায় হয়ে লক্ষ্মী পুরুত ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। গোটা পরিস্থিতিই তিনি ভাল করে জানেন। তাঁকে অনুনয়ের সুরে বললাম, কাকু, সুজিত বড়ো অসহায়। এ-অবস্থায় তার, পরে একটা চাপ সৃষ্টি না করে আপনি অন্ততঃ চলুন। বেলাও পড়ে এল। সামনে অন্ধকার রাত। আপনি এলেই আর দু'চারজন আমরা পেয়ে যাব। মনে হল, পুরুত ঠাকুর নরম হলেন। গলা খাট করে একরকম আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, এক কাজ কর নতু, আমার ঘরে গামছা-কাপড় আছে, আতপ চালও না হয় ক'টা দিয়ে দেব। তুই হাঁদা পুরুতকে ডেকে যা হোক একটা নমঃ নমঃ করে কাজটা সেরে ফ্যাল গিয়ে। তা হলেই আর কেউ আপত্তি করবে না।

—কাকা!

—আবার কাকা কি? যা, গামছা-কাপড়ের দাম দিতে হবে না আমাকে।

—কাকা, ব্যাপারটা ওখানে নয়। আসলে সুজিৎ ওই প্রায়শ্চিত্তেরই বিরোধী।

—কেন? বিরোধী কেন?

ওকি নাস্তিক? ওকি ম্লেচ্ছ? ও যদি ধর্ম্ম না মানে, তাহলে ওর মাকে আমরা পোড়াতে যাব কেন?

—না না, ধর্ম না মানার কথা নয়। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, প্রায়শ্চিত্ত করলে ওর নিষ্পাপ মাকে অপমান করা হবে।

—তুই আসতে পারিস নতু; আমাকে ওর মধ্যে জড়াবি না। আমাদের সমাজের মাথা নবীনদা আছেন, তার কাছে যা।

অগত্যা আমাকে সমাজপতি নবীন চাটুজ্জের বাড়ীতেই যেতে হল। গিয়েই জ্যাঠা মশাইকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো মাথায় নিলাম।

—বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো বাবা। তুমি আবার শবটব ছুঁয়ে আসনি তো?

আমি একথার উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, জ্যাঠামশাই, সুজিৎ বিপন্ন। এ সংসারে তার আর কেউ নেই। আপনারাই এখন সব। এ অবস্থায় চলুন, আমরা তার মায়ের সৎকার করি। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য সুজিৎ আমাকে পাঠিয়েছে।

—না না না, সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই। আমরাই তো সব। এ দুঃসময়ে আমরা দূরে সরে থাকলেই বা চলবে কেন? আমরা তো নিশ্চয়ই যাব। এটাতো আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। আর শাস্ত্রেই তো বলে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ—

—তবে চলুন, জ্যাঠামশাই। আপনার কথায় আমি খুব খুশী হলাম।

—যাবো তো নিশ্চয়ই। কিন্তু নতু, ওই সুজিৎ ছোকড়া আবার কি একটা জিদ করে বসে আছে না কি?

—কি রকম?

ও নাকি শবের প্রায়শ্চিত্ত করবে না?

—প্রায়শ্চিত্ত কি অপরিহার্য, জ্যাঠামশাই ?

—হ্যাঁ, অপরিহার্য।

দু' জনেই কিছু সময় চুপ করে বসে থাকলাম। দূরে কোথায় সন্ধ্যা-রতির বাজনা বেজে উঠল, সারাদিন স্নান হয়নি। কিছু খাওয়ার সুযোগও হয়নি। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে শান্তি একটা কেরোসিনের কুপী আমাদের সামনে রেখে চলে গেল। আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম, এলোমেলো চিন্তাভাবনা মাথার মধ্যে তোলপাড় করছিল। বুঝলাম, এখানে অনুনয় বিনয় বারবার আঘাত খেয়ে খেয়েই ফিরে আসবে ; অথচ দু' এককথা না বলেও উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বললাম—

জ্যাঠামশাই, দিনকাল দ্রুত বদলে যাচ্ছে। দেশ ভাগ হয়ে গ্যাছে ; আমরা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু। আমাদের কি ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষা করার নেই ?

—তুমি কি বলতে চাও, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমি বলছিলাম, আমাদের শাস্ত্রীয় বাড়াবাড়ি আমাদের সমাজকে অনেক সময় বিপন্ন করে। আমরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হই।

—তুমি কি আমাকে শাস্ত্র আর ইতিহাস শেখাতে এসেছ ?

—ছিঃ ছিঃ। এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি শুধু সবিনয় নিবেদন রেখেছিলাম ; যাতে করে আপনারা সবাই গিয়ে সুজিতের পাশে এ দারুণ বিপদের সময় দাঁড়ান।

—কিন্তু সেতো ম্লেচ্ছ।

—একটা নিতান্ত বালকের সাথে শাস্ত্রের বাড়াবাড়ি না করলে কি চলে না, জ্যাঠামশাই ?

—এটা বাড়াবাড়ি হল ?

—আমি তাই মনে করি।

—বেশ ! তাহলে তুমি আসতে পার।

—বেশ ! আমি যাচ্ছি। কিন্তু জ্যাঠামশাই, সুজিৎ যদি এমন বিপদের দিনে তার ধর্মের, তার সমাজের লোকদের পাশে না পায় ; তবে সে কি এটা খুব সহজে মেনে নেবে ?

—কি করবে ?

—ধরুন কাল যদি ও ধর্ম, সমাজ, সব কিছুর মাথায় পদাঘাত করে ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় চলে যায় ?

—হাজার হাজার বছর ধরে এরকম অনেক চলে গ্যাছে। তাতে আমাদের সনাতন ধর্মের কিছুই হয়নি।

—আপনি বলছেন, হয়নি ? আমি বলছি হয়েছে, অনেক কিছুই হয়েছে এবং এতে করেই ইতিহাসের নিষ্ঠুর পথ বেয়ে আমরা আজ অভিশপ্ত, লাঞ্ছিত, সংখ্যালঘু।

—তুমি এখন আস, নতু। আমার আহ্নিকের সময় হয়ে গ্যাছে।

আরও কিছু কড়া কড়া কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সুজিৎ আমার পথ চেয়ে বসে আছে, একথা ভেবেই আমি হন হন করে ওখান থেকে চলে এলাম। এসে দেখি, সুজিতদের বাড়ীতে একটা অসহ্য নিস্তব্ধতা। শবের শিয়রের কাছে একটা হারিকেন জ্বলছে। সুজিৎ মায়ের পায়ের কাছেই হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়ে বসে আছে। বারান্দার ভিতের সঙ্গে হেলান দিয়ে উঠানে ঘোষ বুড়ি ঝিমুচ্ছে। সুজিতের মাতৃ-বিয়োগের ব্যথা বেদনা আমি ভুলে গেছি। আমি কাছে আসতেই সুজিৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

—না। কিছু হল না সুজিৎ। আমি বাড়ীবাড়ী গ্যাছি। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া শব দাহ হবে না।

স্থির অপলক নেত্রে সুজিৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল। আমি ওর পাথরের মত মুখখানার দিকে চেয়ে থাকলাম। আমি ওই পাথরের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে লাখো লাখো মাতৃহারা পিতৃহারা সন্তানের এ লাঞ্ছিত অভিমানী মূর্তির মিছিল দেখতে পেলাম। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম—

—এখন কি করবি সুজিৎ ?

—তুই একবার ওগ্রামে সামসুকে খবর দে।

আমি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। প্রশান্ত কণ্ঠে সুজিৎ বললে—

—আরতো উপায় নেই নতু।

—না, আমি বলছিলাম কি, মানে ; এ পথে তো এগুনো যাবে সুজিৎ, পিছনো তো যাবে না।

—পিছনের পথ কি আর আমার জন্য খোলা আছে ?

—কিন্তু !

উত্তরে প্রতিপক্ষের কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল !

—আমি জানি, খবর পাওয়া মাত্রই সুজিতের আবাল্য বন্ধু সামসু লোকজন নিয়ে ছুটে আসবে। বুক দিয়ে পড়ে যে-কোন রকম সাহায্যই তারা করবে। কিন্তু সুজিতকে আর পিছনে ফেরার রাস্তা দেওয়া হবে না। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমার স্নেহস্পদ ছাত্রপ্রতিম নীতীশের কথা। সে পাশের গ্রামেই থাকে। আমি বললাম—ঠিক আছে, তুই ঘাবড়াবি না, আমি যাচ্ছি, সামসুই হোক, বা অন্য লোকই হোক, এবার সঙ্গে করেই নিয়ে আসব।

আমি কাকিমাকে ছুঁয়ে বসছি। তুই একটু চোখেমুখে জল দিয়ে আয়। বলেই জোর করে ওকে টেনে তুলে দিয়ে বসে পড়লাম। একটা দারুণ উত্তেজনা আমাকে ক্রমশই অস্বাভাবিক করে তুলছিল।

নীতীশকে নিয়ে যখন সুজিৎদের বাড়ী ফিরে এলাম, তখন পল্লী-গ্রামের রাত্রি এগারটা। সে শুনেই আমার সঙ্গে ছুটে এসেছে। মা-বাবার অনুমতি নেওয়ার ধারও সে ধারে নি। পথে আরও দু'তিন জায়গায় আমরা হানা দিয়েছিলাম। কিন্তু সব জায়গা থেকেই আমাদের শুধু হাতে ফিরতে হল।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী। গ্রামের শ্মশান গ্রামের বাইরে শীর্ণতোয়া নদীতীরে। সেখানকার জঙ্গলাকীর্ণ ভয়াল পরিবেশ। তার ওপর এই দারুণ অন্ধকার নিশীথিনী। একটা হ্যাজাক-লাইট টাইট হলে ভালই হতো। কিন্তু প্রস্তাব উঠতেই নীতীশ বললে, ছাড়ুনতো, নতুদা। আলোর নিকুচি করি। আমি একাই একশো। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি তো কুড়ুল কোপাবো বলেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবু যা হোক, শুকনো আমকাঠ সুজিতদার বাড়ীতেই রয়ে গ্যাছে। আপনি আসুনতো। দু'জনে কাঠগুলো আগে শ্মশানে নিয়ে যাব।

কিছু ভাববেন না। আদৌ ঘাবড়াবেন না। আপনারা যে কেন দিনের বেলায় আমাকে খবর দেননি। ঘোষবুড়ী একটা আলো ধরল। শুকনো আমকাঠ, যেগুলো সুজিতের মা-ই সারা বছরের জ্বালানীর জন্য চেরাই করে রেখেছিল, তাই-ই আমরা দঁড়ি দিয়ে দুটো আঁটি বেঁধে ফেললাম। সারাদিনে খাওয়া না হলেও কোথেকে গায়ে যেন অসুরের বল এল। বিরাট দু' আঁটি কাঠ দু'জনে মাথায় নিয়ে অন্ধকার পথ দিয়ে শ্মশানে এসে উপস্থিত হলাম। ডোমকে ডেকে এনে তাড়াতাড়ি চিতাটা সাজিয়ে ফেল্লাম। ওকে বল্লাম, মুনিয়া, তুই থাক। আমরা তাড়াতাড়ি শব নিয়ে চলে আসছি। ফিরে এসেই শব বেঁধেছেদে বড় এক আঁটা পাট-কাঠিসহ যখন যাত্রা করব তখনই হঠাং মনে পড়ে গেল, আচ্ছা! সবাইকেই তো ডেকে ব্যর্থ হলাম, তিনু কাকার কাছে তো একবারও গেলাম না। আমি বললাম—সুজিং, একটু অপেক্ষা কর। আমি আর নীতীশ এক দৌড়ে তিনু কাকাকে একবার অনুরোধ করে আসব। সুজিং দৃঢ়তার সাথে বলল, নতু, হাঁদা পুরুতকে আর ডেকে দরকার নেই। কেউ আসবে না। শুধু শুধু আর রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে কি লাভ? আমার আর কাউকে দরকার নেই। তবু আমার এটাই সান্ত্বনা যে দু'জন শ্মশান-বন্ধু অন্ততঃ পেয়েছি। নীতীশও বলল,—ছাড়ুন তো নতুদা। কেউ যেখানে এল না, সেখানে কি আর হাঁদা পুরুত আসবে? অগত্যা তিনজনকেই শ্মশানের পথে পা' বাড়াতে হ'ল। নীতীশ ও সুজিং লাস কাঁধে তুলে নিল। আমার হাতে হারিকেন আর পাটকাটির আঁটি। ঘোষবুড়ী হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। সুজিং একটুও কাঁদল না। নীতীশের চোখ ছল ছল করে উঠল। আমি অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করলাম। সুজিতের মনের মধ্যে যে-ঝড় বইছিল তা আর কেউ না বুঝলেও আমিতো বুঝতে পারছিলাম।

শ্মশানে পৌঁছে আমরা তাড়াতাড়ি সব কাজ সমাধা করে শব চিতায় তুলে দিলাম। মন্ত্রতন্ত্র জানি না, পঞ্জিকার পেছনে শবদাহের যে-বিধান আছে তা থেকেই যতটা বুঝি তা-ই আমি করলাম। আজকের এ অনুষ্ঠানে আমিই পুরুত-ঠাকুর। সুজিং নদীর জলে ডুব দিয়ে এসে ভিজে

কাপড়ে অনুষ্ঠান সমাধা করলে। এবারে মুখাগ্নি করতে হবে। পাটকাঠি দিয়ে চারটা আঁটি বেঁধে ফেললাম। এবার আর এক নতুন বিপদ উপস্থিত হ'ল। চারটা আঁটি চারজনকে হাতে নিতে হবে। কিন্তু আমরাতো তিনজন। নীতীশ এত বড় সমস্যাটা পলকের মধ্যে সমাধান করে দিল। সে একটা আঁটি মুনিয়ার হাতে দিয়ে বলল—নে, ধর। আমাদের সাথে ঘুরবি। প্রথম সুজিৎ, তারপর নীতীশ, তার পেছনে মুনিয়া এবং সবচেয়ে পেছনে আমি। পাটকাঠিতে অগ্নিসংযোগ করা হল। আমার বা হাতে পঞ্জিকা। আমি পাটকাঠির আলোয় পঞ্জিকা দেখে মন্ত্র উচ্চারণ করব, আর সুজিৎ বলে যাবে। সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে শবের মুখে অগ্নিস্পর্শ করিয়ে জ্বেলে দেওয়া হবে মহাহুতাশন।

এমন সময় ঝোপের মধ্যটা হঠাৎ নড়ে উঠল। আমাদের চারজোড়া চোখই একসঙ্গে ওদিকে পড়ল। দ্রুতপদে যে-লোকটি ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে পঞ্জিকাখানা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর মুনিয়ার হাত থেকে পাটকাঠির আঁটি ছোঁ মেরে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল—ধর্মাধর্ম সমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্‌···সে আর কেউ নয়, তিনু কাকা।

শুকনো কাঠ পেয়ে দাউদাউ করে অগ্নিদেব প্রজ্জ্বলিত হলেন। ভয়াল শ্মশানের ভীষণ অন্ধকার বিদূরিত হয়ে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল। কম্পমান অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব নদী জলে প্রতিফলিত হতে লাগলো। সুজিৎ চুপ করে দূরে বসে আছে। মুনিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে একটা বিড়ি টানছে। নীতীশ তালগাছটার সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার চোখমুখে একটা দারুণ আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। আমি নির্বিকারভাবে বসে বসে ভাবছি আর ভাবছি।

তিনু কাকার একখানা পুরনো গামছা পরিধানে। একখানা নতুন গামছা মাথায় জড়িয়ে বাঁধা। হাতে দণ্ডের বাঁশ। আমার মনে হোল, বহুকাল পড়ে কত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হরিশ্চন্দ্র সুজিতের মায়ের শ্মশানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কারোর মুখে কোন কথা নেই।

শুধু আগুন আপনার মনে আপনি দাউ দাউ করে জ্বলছে। রুক্ষ কণ্ঠে তিনু কাকা বললেন—

—আমাকে তোরা খবর দিলি না কেন?

আমরা সবাই নিরুত্তর হয়েই রইলাম। কারণ দেবার মত কোন উত্তর আমাদের কাছে ছিল না। একটুখানি থেমে আবার বললেন,—

—দেবার মত কোন উত্তর তোদের নেই। হাঁদা পুরুতকে দায় না পড়লে কেউ ডাকে না। তোদের সমাজে আমি চিরকালই হাঁদা। সুজিৎ, নতু, নীতীশ, তোরা সবাই তো এই সমাজেরই মানুষ। তোদের আমি চিনি না? তোরা লক্ষ্মী পুরুতকে পা' ধরে ডবল দক্ষিণা দিয়ে বাড়িতে আনিস না? আমার অসাক্ষাতে তোরা আমাকে হাঁদা পুরুত বলিস না?

এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে তিনু কাকা হাঁপাতে থাকেন।

—তোদের পরে রাগ করেই বা কি করব। আমারই মেয়ে লক্ষ্মী, সে কি আমাকে মানুষ জ্ঞান করে? তার বয়স হয়ে গ্যাছে, বিয়ে দিতে পারিনি, তার কাছেও আমি হাঁদা বাপ।

তিনু কাকা আবার হাঁপাতে থাকেন।

কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ধন্না দিয়ে কি পেলি? তোদের রাজপুরোহিত নবীন চড়া সুদে টাকা খাটায় না? সে মঙ্গল পালের বিধবার জমিখানা অন্যায়ভাবে দখল করেনি? লক্ষ্মী পুরুত সেবার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে গিয়ে দু'সের ঘি-ভরা বয়েমটা চুরি করে ধরা পড়েনি? মাধব পুরুত সেবার ঘোষপাড়া থেকে রাতের বেলায় দৌড়ে খাল সাঁতরে বেঁচেছিল না? যেভাবে গ্রামবাসী বেড় দিয়েছিল, তারা ধরতে পারলে জ্যান্ত পুঁতে দিত না?

আমরা তবু নিরুত্তর। একেত তিনু কাকা উত্তেজিত, তার ওপর এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা কেউই দিতে পারব না।

হঠাৎ তিনু কাকার কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে গেল।

—কিন্তু একটা ছোকরার সাথে জিদ করে এমনভাবে তার মায়ের শব-দাহ বন্ধ করে দিলে? এ আমি কিছুতেই সইতে পারলাম না। জানি,

কালকে আমাকে একঘরে করা হবে। লক্ষ্মীর বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু ধর্মের নামে মনুষ্যত্বের এতবড় অপমান, মানুষের প্রাণে এমন অনাকারণ আঘাত, আমি কিছুতেই সইতে পারলাম না। তাই বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছিলাম। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম, লক্ষ্মীটা কখন ঘুমোয়। ও ঘুমোলেই নিঃশব্দে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শেকল টেনে দিয়ে এসেছি। ঝোপের মধ্যে বসে সব দেখছিলাম। আনন্দে আমার চোখে জল আসছিল যে, এতবড় একটা জিনিসকে তোরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে পেরেছিস। মড়া নিয়ে আবার সমাজ কী ? মড়ার আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের ? আমি মানি না। আমি এসব মানি না।

দণ্ডের বাঁশটা দিয়ে চিতার আগুনটা খানিক উস্‌কে দিয়ে আবার বাঁশটা হাতে নিয়ে তিনু কাকা স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। চিতাগ্নির লেলিহান শিখায় তার মুখখানা কেমন তামটে বর্ণ ধারণ করেছে। ঐ মুখে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা, একটা দারুণ সঞ্চিত ক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইছে। আমি ও-মুখের দিকে যেন তাকাতে পারছিলাম না। তিনু কাকার ঐ কথাটা যেন তাঁর সমস্ত চোখ মুখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, 'আমি মানি না, আমি এসব মানি না।'

—*—

• অবোধ্য •

কলেজের শেষ-পরীক্ষা পাশের সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বরিশাল জিলার মধুমতী নদীর তীরে একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলাম। তখনও মধুমতী জীবন্ত ছিল, ভাদ্র মাসে ভরানদীর জলের গর্জনে বেশ দূরের লোকেরও রাতের ঘুম ভেঙে যেতো। কানায় কানায় ভরা নদী, পাড়ে কাশ ফুলের সমারোহ, জলপথে দিনরাত ষ্টীমার, লঞ্চ ও হাজারো নৌকোর আনাগোনা। শরতের নদীতীর, একেবারে পাশেই স্কুল, প্রাণখোলা ছাত্র-ছাত্রীরা, সরলপ্রাণ সহকর্মিবৃন্দ আমাকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিল। আমার উনিশ-বিশ বছরের আমিটা যেন হঠাৎ জেগে উঠলো নতুন বিস্ময়ে। অবসর পেলেই একা একা নদীর পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়াই। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, ধানক্ষেত, আখক্ষেত, পাটক্ষেত, বালুচর, জেলেদের মাছধরা, সুনীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ, আবার কখনো বা দিগদিগন্ত ঝাপসা করা মুষলধারায় বর্ষণের সাথে আমার একাত্মতা গড়ে উঠলো। বর্ষার নদীর মতোই আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

জনা দুয়েক বয়স্ক শিক্ষকের সাথে স্কুল থেকে মাইলখানেক দূরে নদী-পাড়েই একটি বাড়ীতে মেস করে থাকতাম। নিজেরাই রান্নাবাড়া করে খেতাম। রান্নার দায়িত্ব প্রায়ই আমার ওপর বর্তাতো।

মাস তিনেক পরের কথা। ছুটির পরে সেই ঘুরতে বেরিয়েছি, ফিরতে রাত প্রায় আটটা বেজে গেছে। ফিরেই তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে চলে গেলাম। ইস্! এতো দেরী করে ফেল্লাম! কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। উনুনের পরে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আগুনটা নিভন্ত। বছর ১৫।১৬ বয়সের একটি মেয়ে একটু দূরে চুপ করে বসে আছে। মেয়েটি শ্যামলা, মাথায় খুব লম্বা চুল, চোখেমুখে একটা অসাধারণ দীপ্তি। খুব চটপটে। মুহূর্তে মানুষকে

আপন করে নেওয়ার মতো। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে হেসে দিলো।

—আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি শ্যামলী। আজকেই বোর্ডিং থেকে ফিরেছি। গতকাল স্কুলে পূজোর ছুটি হয়ে গেছে।

—ও! তুমি অতনুর বোন?

—হুঁ!

বলা প্রয়োজন, অতনু ঐ বাড়ীরই বড় ছেলে।

—তা আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন? ভাত হয়ে গেছে। নামিয়ে ফেলুন। মা বল্লেন, রাত হয়ে গেছে। মাষ্টার ফিরছে না। কখন এসে রাঁধবে? তুই ভাতটা চড়িয়ে দে। তাই দিলাম। বলুন, আপনার অনেক সাহায্য হয়েছে কি না?

—হ্যাঁ! তাতো হয়েছেই।

ভাতটা একটু টিপে, হাতাটা দিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া দিলাম। ঢাকনাটা মুখে চাপিয়ে নামিয়ে ফেল্লাম।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি লোহার মাজা কড়াইটা এনে কাছে রাখলো।

—নিন, কড়াইটা বসিয়ে দিন। বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। ইলিশ মাছ আর কাঁচকলার ঝোল। খুব সহজ রান্না।

আমি মাথা নীচু করে আছি। নির্জন রান্নাঘরের মধ্যে টিমটিম করা একটি মাটির কুপির আলো। সত্যি বলতে কি, ওর সঙ্গে, এ অবস্থায় আমার কেমন যেন লাগছে। এমনিতেই আমি ছোটবেলা থেকে লাজুক, তার ওপর আবার একেবারে অপরিচিত একটি মেয়ে। কেন যেন ওর মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছিলাম না। শ্যামলী দূরে এক বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে থেকে দশম শ্রেণীতে পড়ে। আমার এই সলজ্জ ভাবটায় ওযেন একটু মজা পেয়ে গেল।

—ও কী! মাষ্টার দা, কড়াইটা যে পুড়ে গেল! তাড়াতাড়ি তেল দিন। না হয় বলুন, আমি দিয়ে দি-ই।

আমি এবার ওর দিকে চোখ ফেরাতে না-ফেরাতেই ও শিশি থেকে কড়াইয়ের মধ্যে তেল ঢেলে দিল। সন্ধ্যার একটু আগে-ধরা মধুমতীর

ইলিশ। তেলে ছেড়ে দিতেই গন্ধে বাড়ী ভরে গেল। আমি খুন্তী দিয়ে মাছ উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। আবার মাঝে মাঝে কাটা কাঁচকলা-গুলোতে হলুদ মাখছি। শ্যামলী কিন্তু কথা বলেই যাচ্ছে। ওদের বোর্ডিঙের কথা, স্কুলের কথা, দিদিমণিদের কথা, আরও কত কি।

—মাস্টার দা! মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এবারে ওগুলো নামিয়ে ফেলুন। আমি আবার একটু তেল ঢেলে দেই। মাছ থেকে অবশ্য অনেকটা তেল বের হয়েছে। তবুও সর্ষের তেল একটু দেওয়া ভালো।

আমি হাতা দিয়ে মাছ নামাতে নামাতে শ্যামলী একটা বাটি এগিয়ে দিয়ে বল্লো—

—এতে বাটনা করেই রেখেছি।

মাছ নামানো হলে দেখলাম কড়াইর তলায় বেশ তেল জমে আছে। তবুও শ্যামলী একটুখানি তেল শিশি থেকে ঢেলে দিল। তেলটা আর একটু গরম হলে আমি বাঁটা মশলাটা কড়াইতে ঢেলে কলাগুলোও ওর মধ্যে দিয়ে খুন্তী দিয়ে নাড়তে লাগলাম। হঠাৎ শ্যামলীর সংগে চোখা-চোখি হয়ে গেলে ও ফিক করে হেসে দিল। আমি কেমন বিব্রত বোধ করলাম। পরক্ষণেই ও একটু গম্ভীর হয়ে গেল। ক্ষণিকের এই ব্যাপারটুকুতে উভয়েই বুঝতে পারলাম, কি যেন হয়ে গেল।

... .

ষ্টীমারের কর্ণবিদারী হুইসেলে ভোরে ঘুম ভাঙলো। বাড়ীর পিছনেই ষ্টীমার ঘাটা। নিত্যকার অভ্যেস মতো একবার স্টেশনে গেলাম। মুহূর্তের জন্য কী ভীড়! ছোটছোট নৌকাগুলো দুলছে, যাত্রীদের কাছে ইলিশ মাছ বিক্রি করতে জেলেরা এসেছে। নৌকোয় আছে মাছ-ধরা লম্বা লম্বা জাল। একমাল্লাই নৌকোর মাঝিরা হাঁকছে চড়ন-দারের জন্য। তাছাড়া যাত্রীদের ওঠা-নামা, হাঁকাহাকি ইত্যাদি। ষ্টীমার চলে গেলে ঘাট জনশূন্য হবে, একেবারে খাঁ খাঁ করবে।

স্টেশন থেকে ঘুরে এসে বসেছি। বলা বাহুল্য, তখন যেন অফুরন্ত সময় ছিলো। তখন ভাবতাম, সময় কাটাবো কি করে, আর এখন

ভাবি, সময় পাবো কোথায় ? বারান্দায় বসে বসে একটা বই দেখছি। এমন সময় টেবীলের অপরপ্রান্তে চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো শ্যামলী। হাতের টেস্ট পেপারস্‌ ও খাতা টেবীলে রাখলো।

—মাস্টারদা ! কোন্‌ পেপারটা Solve করবো, বলুন।

আমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, ও টেস্ট পেপারসে্‌র পাতা ওল্টাচ্ছে।

—শোন শ্যামলী ! মাস্টার দা' ডাকটা খুব ভালো শোনালেও আমার খারাপ লাগে।

—কেন ? চমৎকার ডাকতো।

—হ্যাঁ চমৎকার বটে। কিন্তু ও নামে ডাকা হতো পরম শ্রদ্ধেয় সূর্য সেনকে। কাজেই ও-ডাক আমাকে একেবারেই বেমানান।

—তা হলে কি বলে ডাকবো ?

ও ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চাইলো।

—তুমি বরং মাস্টার মশাই বলো।

—ধ্যাৎ ! একেবারে বাজে। ওসব বুড়ো মানুষকে বলা যায়। আমি মাস্টারদা-ই বলবো। এক নামে বুঝি আর দ্বিতীয় জনকে ডাকা যায় না ? রবীন্দ্রনাথ অতো বড়ো মানুষ ছিলেন বলে কি আর রবীন্দ্রনাথ নামটাই কেউ ব্যবহার করবে না। তা-ও কি হয় ? আপনি ওসব ছাড়ুন। বলুন, কোন্‌ পেপারটা করবো ?

এরপর থেকে প্রতিদিনই ওকে পড়াতে হতো। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ ওর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়লেই দেখতাম যে, ও এমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে যেন কিছু উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। আমার ভালো লাগলেও আমি ভয় পেতাম। যার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ এখনো বাকী, তার পক্ষে এ ভাবটা অত্যন্ত দোষের। কাজেই খুব সংযত ভাবেই আমি চলতে লাগলাম।

একদিন ওর খাতা correction করতে গিয়ে দেখি, তাতে এক জায়গায় চার-পাঁচবার 'মাস্টার দা' কথাটা লেখা। দেখে চমকে উঠলাম।

... ...

মাঝে এক অধ্যাপক ক'দিনের জন্য ঐ বাড়ীতে এলেন। তিনি এক সময় এ বাড়ীতে থেকেই আমাদের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে কলেজে কাজ পেয়ে চলে গেছেন। যে-ক'দিন অধ্যাপক থাকলেন, সে ক'দিন শ্যামলী আমার কাছে আর পড়তে এলো না। আমি আবার নদীপাড়ে ঘুরে ঘুরে অবসর কাটাতে লাগলাম। অধ্যাপকের সঙ্গে অতখানি ঘনিষ্ঠতায় আমি ঈর্ষান্বিত হলাম কিনা, ঠিকমত হিসেব করতে পারলাম না। তবে আমার যে ভাল লাগলো না, এ বিষয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

কার্তিকের শেষে শ্যামলী টেষ্ট পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এলো। এবারে আমাকেই পরীক্ষা-বৈতরণী পার করে দিতে হবে, এমন একটা কথা শুনলাম। কি আর করি? শুরু করে দিলাম। কিন্তু পাঁচ ছ'দিন পরেই ওর একটা বিয়ের যোগাযোগ হলো। পাত্রপক্ষের দেখাশোনা শেষ হলো। এবারে এলো পাত্র স্বয়ং। পাত্রটির নাম আনন্দ। কিন্তু কি আশ্চর্য! সে যে এ বাড়ীতে এসে কি আনন্দ আবিষ্কার করলো, তা বুঝতে পারলাম না। তিন-চারদিনের মধ্যে পাত্র আর যাচ্ছে না। শ্যামলীও আর পড়তে আসে না। আমি খানিকটা অবাক হলাম। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বল্লাম না। তবে ব্যাপারটা আমার খুবই খারাপ লাগতে লাগলো। বিশেষ করে ভাবী পাত্রটির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতায় আমি যে কেবল বিস্মিত হলাম তা-ই নয়, ভীষণ বিরক্তও হ'লাম। শ্যামলীকে অত্যন্ত খুশী খুশী মনে হতে লাগলো।

স্কুলে জীবন নামে জনৈক প্রাক্তণ ছাত্র সম্পর্কে প্রায়ই প্রশংসা শুনতাম। সে অংকে ৯৮ নম্বর পেয়েছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষায়। পেয়েছিল ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপও। তারপর সে কলকাতা চলে গেছে। সেখানে সে এ সময় একজন প্রতিষ্ঠিত অফিসার। সে ঐ বাড়ীতে থেকেই পড়তো। ওর অনেক প্রশংসা শুনেছি, দেখিনি কোনদিনই।

আনন্দের সাথে শ্যামলীর বিয়ের দিনধার্য হলো অঘ্রানের ৩০ তারিখে। সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। আমার অবৈতনিক অধ্যাপনাও শেষ। ও খুব ব্যস্ত এখন। ভারী হাসিখুশী দেখায়। কদাচিৎ দেখা হয়। ও মাথা নীচু

করে চলে যায়। আমিও ভাবি, সেই ভালো। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন আসতে শুরু করেছে।

আজ ২৮শে অঘ্রান। ভোরবেলা হুইসেল শুনে আমি ষ্টীমার ঘাটে গেলাম। দেখলাম, একটি সুঠাম গঠনের যুবক ষ্টীমার থেকে নেমে হাতের ব্যাগটা শিশুর মতো ঘুরাতে ঘুরাতে ঐ বাড়ীতেই এসে ঢুকলো। আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, শুনলাম সেই জীবন এসেছে কলকাতা থেকে। মিনিট কয়েকের জন্য যেঁচে আলাপও করলাম। স্কুলে গিয়ে উচ্ছ্বাসের সাথেই বল্লাম, সকালের ষ্টীমারে জীবনবাবু এসেছেন। কথাটা শুনেই আমার সহকর্মী হান্নান সাহেব আমাকে ছোট করে বল্লেন, কালকে কিন্তু শ্যামলীর বিয়ে হচ্ছে না তাহলে।

শুনে আমি বিস্মিতভাবে ওর মুখের দিকে তাকালাম। হান্নান সাহেব বল্লেন, যা বল্লাম, দেখবেন।

স্কুল ছুটি হলে বাড়ী ফিরে দেখি সে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। শামলী সারাদিন কিছু খায়নি। সে জীবনকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। কিন্তু জীবন বিয়ে করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে।

আমি তাড়াতাড়ি হান্নান সাহেবের বাড়ীতে ছুটে গেলাম। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে, তিনি এমন পূর্বাভাস দিলেন কেন। তিনি সবটাই চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেন।

আমি শীত উপেক্ষা করেও সন্ধ্যার পরে নদীপাড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে এসে বল্লাম, আমার শরীরটা ভালো নয়, অন্য এক সহকর্মী যেন রান্নার কাজটা সারেন। বলা বাহুল্য, সে-রাতে রান্না বা খাওয়া কোন কিছুই করার মতো বাড়ীতে পরিবেশ ছিল না। কখন লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নেই।

... ...

অনেক রাতে সমবেত কণ্ঠের হুলুধ্বনি ও শঙ্খের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেলে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। তারপর বাইরে

বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, উঠানে চাঁদোয়ার নীচে সব মিলিয়ে ১০।১২ জন মেয়ে-পুরুষ। গোটাতিনেক হ্যারিকেন জ্বলছে। জীবনের হাতে সমর্পিত শ্যামলীর হাত ঘটের ওপর রাখা। পুরুত ঠাকুর মন্ত্র পড়াচ্ছেন, মার্গশীর্ষে মাসি, বিশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে, শুক্লেপক্ষে, ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ·········।

জীবন একবার আমার দিকে তাকালো। শ্যামলী তাকালো কিনা ঠাহর করতে পারলাম না। একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মূর্তির মতো। তারপর এসে শুয়ে পড়লাম। বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম।

ঘণ্টা দেড়েক পরে জীবন সরাসরি আমার শোবার ঘরে এসে হ্যারিকেনটা উস্কে দিল।

—সুবলবাবু, ঘুমোচ্ছেন ?

—না।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে মশারীটা খুলে ফেল্লাম।

—বসুন, জীবনবাবু।

—জীবন বিছানার একপাশে বসলো। কেমন একটু সংকুচিত মনে হলো ওকে।

—তা হলে সব মিটে গেলো ?

—কি যে মিটলো, কি মিটলো না, তা বুঝতে পারছি না। রাত পোহালে যে-কাণ্ডটা হবে তা ভেবে গা শিউরে উঠছে।

—কী আর হবে ? ওরা আসবে, ফিরে যাবে। হয়তো একটা মামলা-টামলা হতে পারে। আর নিন্দুকরা একটু নিন্দাবাদ করবে।

—সুবলবাবু, আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না, বিশ্বাস করুন।

—ওসব এখন আর বলে লাভ আছে ? আপনাদের এখন পরের কথা ভাবতে হবে। এবারে এগিয়ে যাবার পালা।

কিন্তু ও বারবারই আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলো যে, ওর আদৌ বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। আমি তখন একটু বিরক্ত হলাম! বলেই ফেল্লাম—

—যদি আদৌ ইচ্ছে না থাকে, তবে এমন সময় কলকাতা থেকে এলেন কেন ? এ সময় আপনার উপস্থিতি কত মারাত্মক হতে পারে তা কি আপনি বোঝেন নি ?

ও! সে আর এক ইতিহাস। আপিসে যাবো বলে বের হতে গিয়েই শ্যামলীর চিঠি পেলাম। পেয়েই মনটা খুব খারাপ হলো। আপিসে না গিয়ে গেলাম ভিসা আপিসে। জরুরী ভিত্তিতে একদিনেই ভিসাও পেয়ে গেলাম। সেদিনই বিকেলে যাত্রা এবং ভোরে এসে পৌঁছে গেলাম।

—এতো অদ্ভুত যোগাযোগ।

—অদ্ভুতই বটে !

—তবে দেখবেন ?

বলেই জীবন উঠে গেলেন। একটু পরেই একটা চামড়ার ব্যাগসহ আবার এলেন। ব্যাগটা খুলে বের করলেন একটা খাম। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—

একবার পড়ুন তো। ঐতো ক'টা অক্ষর। ওর মধ্যে কি ভয়ানক যাদুই না আছে !

ভাবলাম, লেখায় এমন কি যাদু থাকতে পারে যাতে জীবনের জীবন যায় যায় অবস্থা হলো !

চিঠিখানা বের করে পড়লাম।

শ্রীচরণেষু জীবনদা,

আগামী ৩০শে অঘ্রান ফুলের বাগান তুলে দিয়ে তরকারীর চাষ শুরু করতে যাচ্ছি।

ইতি—
উপেক্ষিতা,
শ্যামলী।

বারবার পড়লাম চিঠিটুকু। দু'হাত দিয়ে মাথাটা ধরে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে আছি। জীবন আস্তে আস্তে কথা বলে যাচ্ছে। কতক কানে

ঢুকছে; কতক হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার মাথায় দারুণ যন্ত্রণা বোধ করছি।

সিনেমা শুরুর আগে পর্দায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর নামগুলো যেমন ভেসে ওঠতে থাকে, তেমনি আমার মনের পর্দায় একটা একটা নাম ও তারপরে একটা একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন ভেসে উঠলো। শ্যামলী কাকে সত্যিকারের ভালবাসে?

অধ্যাপককে? আনন্দকে? জীবনকে? না মাস্টারদাকে?

উত্তর পেলাম না, পাইনি! চিরকাল আমার কাছে অন্ধকার হয়েই রইলো ব্যাপারটা।

সংস্কৃতে একটা প্রবাদ আছে যে, নারীর জটিল মনের সন্ধান না কি দেবতাদেরও অজ্ঞাত, মনুষ্য কোন্ ছাড়! নারী-মনের সূক্ষ্ম গ্রন্থির প্যাঁচে প্যাঁচে কতই না বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্যের জটাজাল ভেদ করা আনন্দ, জীবন, অধ্যাপক, সুবল, কারোর পক্ষেই কী সম্ভব! যে-আঘাত, যে-বেদনা আজকে হৃদয়-মথিত করে দিচ্ছে তা থেকে আনন্দবাবুর জীবন আনন্দময় হয়ে উঠুক। তবে আনন্দের আজকের আনন্দ কী……।

না। আর প্রশ্ন করে কী লাভ?

—*—

ঃ ভাগ ঃ

রামানুজ লক্ষ্মণ যেমন জীবনের সব কথা ভুলে গেলেও ভুলতে পারেন না শক্তিশেলের বেদনা, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন পারেন না ভুলতে অভিমন্যু-হত্যার জ্বালা, তেমনই আমিও পারিনা ১৯৭১ সনকে একেবারে বিস্মৃত হ'তে। তখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, আর পূর্ব-ভারতের তিন-চারটি রাজ্যে এককোটির মত বাংলাদেশী শরণার্থী। পশ্চিমবঙ্গের পরেই চাপটা বেশী, পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে প্রচণ্ড ভীড়, তাই পথে না বেরিয়ে পারলে বেরই হই না।

আমি তখন খড়দার কোন একটি কলোনীতে দিদির বাসায় থাকি। সকাল-সন্ধ্যা ছাত্র-পড়ানো, বাকী সময়টা কাটে খবরের কাগজ, ট্রাঞ্জিস্টার আর মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা নিয়ে। আমাদের বাসার পেছনের বাসায় কিছুদিন হ'ল একটি শরণার্থী পরিবার এসে উঠেছে। সম্প্রতি ঝগড়া-ঝাঁটি ও-বাসায় একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের বাসা আর দিদির বাসার মাঝখানে উঁচু দেওয়াল থাকায় এপাশে দাঁড়িয়ে ও-বাসার লোকজনের কথাবার্তা শোনা যায় ; কিন্তু ওদের দেখা যায় না। লুকিয়ে লুকিয়ে কথা শুনতে কেন যেন খারাপ লাগে। দেওয়ালের কাছেই টিউবওয়েল, ওখানে যখন যাই তখন প্রায়ই কলহের ছিটে ফোঁটা কানে আসে।

সেদিন শরীরটা ভাল ছিল না বলে আর পড়াতে যাইনি। সকালে উঠেই খবরের কাগজের প্রথম পাতায় মুক্তি-যুদ্ধের সংবাদের পরে চোখ বোলাচ্ছিলাম। দিদি চা দিতে এসে বললে—

—এই যা, সকাল বেলায়ই আজ শুরু হয়ে গেল। তুই খবরের কাগজটা নিয়ে ছাদে গিয়ে বস, সতু, সব শুনতে পাবি। বিপদে পড়ে এসেছে। শত হলেও তো একমা'র পেটের ভাই। অথচ থাকতে

ওদের দেবেই না। ওদের শরণার্থী শিবিরে যেতেই হ'বে। সল্টলেক ছাড়া ওদের জায়গা নেইরে।

ছাদে যাওয়ার প্রস্তাবটা কেন যেন আমার মনে ধরলো। আমি খবরের কাগজটা নিয়ে ছাদে উঠে ঐ বাড়ীর দিকে পিঠ দিয়ে বসলাম। খবরের কাগজের দিকে আমার চোখ, কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে আছি ওদের কথা শোনার জন্যে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে একপলক দু'পক্ষকেই দেখে নিলাম। কাপড়-চোপড় দেখেই বুঝতে পারলাম কা'রা শরণার্থী, আর কা'রা ওখানকার স্থায়ী অধিবাসী। আর কথাবার্তা শুনে, কণ্ঠস্বর, ভাষা ও উচ্চারণ পদ্ধতিতে না দেখেই কারা কোন পক্ষ তা' বুঝতে পাচ্ছিলাম। ঝগড়া যেভাবে মোড় নিচ্ছিল তা'তে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, ওদের খুব শীগ্গিরই এখান থেকে সরে যেতে হ'বে।

পাঁচ-ছ'দিন পরের কথা, আমি বাজার ক'রে ফিরছি। দেখলাম শরণার্থী পরিবারের প্রধানও বাজার ক'রে বাড়ী ফিরছেন। যেঁচেই কিঞ্চিৎ আলাপ করলাম। তাঁকে বললাম, "পাশের বাসায়ইতো থাকি। দুপুর বেলা আপনি আসবেন। আপনাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে গল্প শুনবো।" এরপর উনি দু'চার দিন দুপুরের দিকে দিদির বাসায় এসেছেন, আমাদের অনেক গল্পও হয়েছে। তবে, পারিবারিক জীবন সম্পর্কে, বর্তমান সংকট সম্পর্কে, আমি কিছুই জানতে চাইনি। ওদিকটা আমি সযত্নেই পরিহার করেছি। উনিও কখনও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলেন নি। ভদ্রলোককে খানিকটা মন-মরা এবং একটুখানি গম্ভীর-রূপেই দেখেছি। কেন যেন এই পরিবারটির প্রতি এবং বিশেষতঃ এই লোকটির প্রতি আমার একটা সহানুভূতি মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠলো। উনি কাছে এলেই ভালো লাগত, প্রাণ খুলে গল্প করতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম, উনি আমার কাছে মনের কপাট খুলতে পাচ্ছেন না।

সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে অক্টোবর ছুঁই ছুঁই করছে। পূজো এসে গেছে, পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে প্যাণ্ডেলের বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। বাসায় বাসায়

নতুন জামা-কাপড় কেনার হিড়িক। ছেলেদের চাঁদার খাতা নিয়ে সকাল বিকেল আনাগোনা। এ পরিবারটির জন্য পূজো যে আনন্দের চাইতে অনেক বেশী বেদনা বহন ক'রে আনবে, সে-কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমিই বা কী করতে পারি। দুঃখ বোধ করা ছাড়া দুঃখ দূর করার সাধ্যতো আমার নেই। সব কিছু ছাপিয়ে এই লোকটির ছোট বাচ্চা দুটির কথা আমার বিশেষ অনুভূত হ'ল।

সেদিন দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে একটি সাহিত্য-পত্রিকা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় দিদি ডাকলো—

—সতু, ও সতু, ঘুমোচ্ছিস না কি?

—ঘুম ভেঙ্গে গেল, —কি হয়েছে দিদি?

—ঐরে, ঐ পরিবারটা চ'লে যাচ্ছে, আর থাকতে পারলো না। আমি উঠে বসলাম, তখনও ঘুমের নেশা কাটেনি।

বললাম, "কোথায় যাচ্ছেরে?"

—তাতো জানি না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি জামা-প্যাণ্ট প'রে বেরিয়ে এলাম, চোখে-মুখে একটু জল দেওয়ারও সময় হ'ল না। পথে এসে দেখি, ওরা সত্যি চ'লে যাচ্ছে। ওদের গতিবিধি দেখে মনে হ'ল, ওরা স্টেশনের দিকেই যাচ্ছে। পরিবারটি বড়। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও একটি বড় মেয়ে, একটি বড় ছেলে। এছাড়া ছোটছোট আরও দুটি ছেলে, দু'টি মেয়ে, সর্বমোট আটজন। প্রত্যেকের কাপড়-চোপড় আর লটবহর দেখলেই বোঝা যায়, এরা উদ্বাস্তু। পোশাক-আশাক, জিনিষ-পত্র, চোখ মুখের চেহারা সব কিছুতেই মাখানো।

এদের প্রত্যেকের সংগেই কিছু-না-কিছু জিনিষপত্র। বড় ছেলেটির মাথায় একটি বস্তাবন্দী ময়লা বিছানা, বড় মেয়েটির হাতে দু'টি বেতের ঝুড়ি। গৃহিনীর হাতে একটা বড় স্যুটকেস, মেজ ছেলেটির মাথায় মাদুর ও হোগলা মিলিয়ে খান দু'তিন জড়িয়ে বাঁধা এবং তার ওপরে একটি কালিপড়া অ্যালুমিনিয়ামের বড় হাঁড়ি। মেজ মেয়েটির

মাথায় একটা চটে বাঁধা বাসন-কোসন, ঘটিবাটি ইত্যাদি। ভদ্রলোকের নিজের ছ'হাতে ছটো বড় মোট। ছোট ছেলেটির হাতে একটা কড়াই। এমনি ক'রে প্রত্যেকের সঙ্গেই কিছু-না-কিছু জিনিস পত্র রয়েছে।

এরা চলেছে, রাস্তা ধরে ধীর পায়ে স্টেশনের দিকে। এখন সেপ্টেম্বরের শেষ। এখন আর এদের দিকে কেউ তাকায় না। কিন্তু এপ্রিল মে মাসে যখন শরণার্থীরা সীমান্ত অতিক্রম করে এখানে আসতো, এখানকার মানুষদের কৌতূহলের তখন অন্ত ছিল না। লোকজন এগিয়ে আসতো, ওপারের সংবাদ জিজ্ঞেস করতো। একটা আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস দিত, অনেক ছাত্রসংস্থা, অনেক মিশনারী দল, অনেক সামাজিক সংগঠন বুক দিয়ে পড়ে এদের সেবা করতো, এদের শিবিরে পৌঁছে দিত, শরণার্থী-কার্ড বের করে দিত। কিন্তু আজ যেন সরকারী সহানুভূতি ছাড়া এদের আর তেমন কিছুই প্রাপ্য নেই। তাই এদের দিকে তাকানোর মতো চোখও মেলে না। আর এরাও যেভাবে একদিন এবাসায় এসে উঠেছিল, আজকে ঠিক তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাই এরা বড়ো উদাসীন। এরা মাথা নীচু করে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পরিবারটির পিছু পিছু নিঃশব্দে, সন্তর্পনে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। স্টেশনে পৌঁছেই মাইকের ঘোষণা শুনলাম। যাত্রীবিক্ষোভের দরুণ আপ ও ডাউন উভয় দিকের ট্রেনই বন্ধ। এবং কখন পুনর্বার ট্রেন চলবে তা বলতে কর্তৃপক্ষ অক্ষম। ওরা গিয়ে ছ'নম্বর প্লাটফর্মের উত্তর প্রান্তে দূর্বার ওপর জিনিষ-পত্র রেখে বসে পড়লো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, বেলা তখন ছ'টো।

আমাকে দেখেই ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—

—আপনি তো এই সময় ঘুমান। আপনিতো সন্ধ্যার দিকে বাইরে যান। তা এই সময়ে কোথায় চললেন?

—না—মানে, এই ঘুমোচ্ছিলামই। দিদি বললেন, আপনারা চলে যাচ্ছেন, তাই আপনাদের ট্রেনে তুলে দিতে এলাম।

ভদ্রলোক বিস্ময়-ভরা চোখে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন, ভদ্রমহিলা এবং ছেলেমেয়েরাও আমার দিকে এমনভাবে তাকালো, আমি তাতে লজ্জিত বোধ করলাম। বড় মেয়েটি বললো, বাবা?

হ সীমা, উনিই সতু বাবু। ওনার কথাই তোদের কইছি।

সীমা বললো, বাবা আপনার কথা প্রায়ই বলে। আজ আপনাকে চোখে দেখলাম। ভালোই হলো। আজ না হ'লে তো আর কোনদিন দেখাই হতো না। তা আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন, এই বস্তাটার উপর একটু বসুন না কষ্ট করে।

না না, বস্তার পরে কেন? আমিও দূর্বার পরেই বসছি। বলেই আমি ওদের কাছে বসে পড়লাম। ভদ্রলোক চুপ করেই বসে আছেন। কিন্তু সীমা এবার মুখ খুললো।

—দেখুন, আপনার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাবার সাথে দু'দিনের পরিচয় মাত্র। তা আপনি এই বিপদের সময় আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। কিন্তু কাকা কি আজকের দিনটায় ছুটি নিতে পারতেন না। ভদ্রলোক একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সীমা, ছাড়তো ওসব।

কেন ছাড়বো বাবা? এখন আর ভয় কিসের, সংকোচ কিসের? আজ আমরা সত্যিকারের পথের ভিখারী হয়ে গেলাম। ভিখারীর ভয় ও লজ্জা থাকাই অপরাধ। সীমা আবার আমাকে বললে—দেখুন দাদা, আমরা যখন বাসা থেকে বেরিয়ে আসি, তার আধ ঘন্টা আগে কাকীমা বেরিয়ে গেছেন। তার নাকি এক সপ্তাহ আগে সিনেমার টিকিট কাটা ছিলো। আমরা আসার সময় কাজের বউটা শুধু বাসায় ছিল। এ লজ্জা, এ দুঃখের কথা বললে বাবা উল্টো আমাদের উপর রাগ করে।

আমি এসব কথার কি উত্তর দেব, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। শুধু নীরব শ্রোতা হিসেবে শুনছিলাম। এবার বড়ো ছেলেটি মুখ খুললে—

—বাবা যে আমাদের কিভাবে ডুবিয়েছে তা হিসাব করার সময় আর জীবনে পাবো না।

আমি বললাম, কেন?—একথা বলছো কেন?

বাবা তো আমাদের জন্য কিছুই করেনি। বাবা যা করার তা করেছে কাকার জন্য। আর বাবার যা অবশিষ্ট ছিল, তা লুঠ হয়ে গেছে, পুড়ে গেছে। এখন যে আমরা কোথায় যাচ্ছি তা জানি না। কাজেই অতীত শেষ হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। আর বর্তমান? তাতো দেখতেই পাচ্ছেন।

কথায় কথায় জানতে পারলাম; ছেলেটি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আর মেয়েটি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। আর ছোট ভাই-বোনেরাও পড়াশুনা করতো। আমাদের কথোপকথনের সূত্র ধরেই এক সময় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ভদ্রলোক মুখ খুললেন। এমনিতেই ভদ্রলোক গম্ভীর প্রকৃতির, তার ওপর এ ভীষণ অকূল পাথারে পড়েছেন। তাছাড়া বড় ছেলেটি আর বড় মেয়েটি প্রতিটি কথার মধ্যেই বাবাকে খোঁচা দিচ্ছিল। কাকার পরে কোনো দোষারোপ বা কাকার কোনো নিন্দা বাবার যে ভালো লাগে না, এটাই ওদের ক্ষোভের বড় কারণ। কিন্তু এবারে ভদ্রলোক মুখ খুললেন।

দ্যাখেন ভাই, ও দ্যাশেথ্যা যারাই এখানে আইসে তারাই নাকি বলে যে, তাদের বাড়ীতে দালান-কোঠা ছিল, ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল, অনেক জমি-জমা, মান-সম্মান, প্রতিপত্তি ছিল। তাই আমি কোথাও নিজের সম্পর্কে মুখ খুলি না। আপনার সাথে ক'দিনেরই বা পরিচয়। যা হউক আপনার সাথে মিশ্‌ছি, আপনি এ বিপদের সময় আমাদের কাছে আসছেন। তাই দুই এট্টা কথা আপনারে কইয়া যাই। ছাওয়াল মাইয়ারা আমার পরে রাগ করে। রাগ ওরা করতে পারে; কিন্তু জানেন ভাই, আমি কোনো ভুল করি নাই। আমি আমার নিজের মনের কাছে, ভগবানের কাছে, খালাস আছি।

আপনি তা হলে একটু বলুন না, আমি তো সবটা বুঝতে পাচ্ছি না। কারো পারিবারিক জীবনের ইতিহাস জানতে চাওয়ার মতো কৌতূহল

আমার নেই। তাছাড়া এ ইতিহাস তো সুন্দর-ও নয়। তবুও এ মুহূর্তে কেন যেন মনে হচ্ছে, একটুখানি জানতে পারলে ভালোই হতো।

—শোনবেন ?

—হ্যাঁ, শুনবো, বলুন।

—তবে শোনেন। আমার নাম বিপিন বিহারী পাল। বরিশাল জেলার ঝালকাঠি নদীবন্দরে আমার বাড়ী। আমার যখন চইদ্দ বছর বয়স, তখন বাবা হঠাৎ মারা গ্যালেন। ভাইডির বয়স তপন পাঁচ বছর। আমরা দুই ভাই ও এক বোন। বোনডা আমার চাইতে দুই বছরের ছোট। বাবার মৃত্যুর পরদিন সকালে বাবাকে না দেইখ্যা ভাইডি যখন কাঁদছিল, আমি তখন অরে কোলে নিয়া কইলাম, আমিই তো আছি। তোর কোন চিন্তা নাই। অর জন্য সেদিন আমার খুব কষ্ট হইছিল। অরে সান্ত্বনা দিতে গিয়া আমিও কাঁদছিলাম। বাবার আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। আমি তখন সবে মাত্র ক্লাস নাইনে উঠছি। ঝালকাঠি স্কুলেই পড়তাম। পড়া বন্ধ হইয়া গেল। নিরুপায় আমি একটা বড় দোকানে কাজ নিলাম। সেখানে সকালেথ্যা অনেক রাইত পর্যন্ত ভূতের মতো খাটতে হইতো। তাতেও সংসারে কষ্টের অবধি ছিল না। কিন্তু পরিবারকে বাঁচানোর জন্য আমার এছাড়া উপায়ও ছিল না। তিন চাইর বছর এইরকম খাটলাম। কিন্তু একটা জিনিষ হইলো, আমি ব্যবসার মূল সূত্রগুলা রপ্ত কইর‍্যা ফ্যাললাম। মাত্র আঠার বছর বয়সে আমি নিজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুদির দোকান দিলাম। এবার আস্তে আস্তে আমার ভাগ্যের পরিবর্তন আরম্ভ হ'ল। কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য হ'ল ভাইকে মানুষ করা। বোনডারে বিয়া দিলাম। ভাইকে পড়াতে লাগলাম। ভাইডি লেখাপড়ায় ভালোই ছিল।

ভাইডি ক্লাসে ফাস্টো হইতো, সেডা কইলা না ? স্ত্রী লোকটি বল্লেন। বড় মেয়েটি ও বড় ছেলেটি মায়েব কথার প্রতিধ্বনি করে বলে উঠলো, ও-কথা বাবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবেই, তোমার চিন্তা নাই মা। বাবার তো কিছু কথা মুখস্থ করা। আমার ভাইটি ঝালকাঠি স্কুলের ফাস্ট বয়

ছিল। আমার ভাইটি ফাস্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। আমার ভাইটি গ্রাজুয়েট।

মহিলা বললেন, এবার হইলতো? তোমার গর্বের ভাই তোমারে ক্যাম্পে পাঠাইলো তো? শ্বশুর বাড়ীতে পাও দিয়াই এই ভাই সম্পর্কে আস্ফালন শোনতে আরম্ভ করছি। আর আইজ বুড়া হইয়া গ্যালাম। সেই আস্ফালন সমানে চলছে। আইজ পূজার এক সপ্তাহ আগে এই আণ্ডা-বাচ্চা লইয়া এখন ক্যাম্পে যাও। এই ছোড বাচ্চা-গুলা মরবে। আমাগো চোখের উপর দিয়া এ্যারা চইল্যা যাবে। আমার মাইয়াডার ইজ্জৎ থাকবে না। আর তুমি? তোমার তো বুকের হাড়গুলা এখনই গোনা যায়। তোমারও যা হবে তাতো আমি দিব্য চোখে দ্যাখতে পারি। আইজ এট্টা সত্য কথা কও তো, তুমি ভাইর পিছনে কত হাজার টাকা দিছো? তুমি হুণ্ডি কইর‍্যা কইর‍্যা টাকা পাঠাইতা, আর আমি ট্যার পাইয়া এট্টু জিজ্ঞাস কল্লেই আমার পরে ত্যালে-বাগুনে জ্বইল্যা উঠতা না? তুমি একদিন আমারে কইছিলা না, ছোড লোকের মাইয়া। আমার মন ছোড।

বিপিন বাবু মাথা নীচু করে থাকে। বড় ছেলেটি বলে, না বাবা, আমার মামা-বাড়ীর কেউ ছোটলোক না। আর আজ যদি তারা এই দেশে থাকতো, আমরা যদি তাদের বাসায় গিয়া উঠতাম, এইভাবে কুকুর—বিড়ালের মতো তাড়াইতো না।

বড় ছেলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ভদ্র মহিলা আর একটু দৃঢ়তার সাথে বলেন—

তুমি স্বামী। তোমারে মন্দ কথা বলায় পাপ। তোমারে দুঃখ দেওয়া আমার অন্যায়। কিন্তু আমারে ছোড লোকের মাইয়া কইছিলা। কিন্তু আইজ বুকে হাত দিয়া কওতো, ছোড লোকের রক্ত কাগো? ভদ্রলোক একবার সচকিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না।

আমি বললাম, থাক্ থাক্, এমন দুঃসময়ে উনি এমনিতেই ভেঙ্গে পড়েছেন। এ সময় আর ওনাকে আঘাত করা ঠিক হবে না।

সীমা—বাবাকে আঘাত করা আমাদের কারোরই উদ্দেশ্য নয়।

বাবা সরল-সহজ মানুষ। সারা জীবন বাবা শুধু খেটেই গেলো, বিশ্রাম পেল না। কিন্তু একবার বলুনতো, যে-ভাইর জন্য বাবার এতো গর্ব, যার জন্য বাবা এতো করেছেন, এমন বিপদের দিনে সে ভাই কি করলো?

বিপিন—তোর কাকাও তো বিপন্ন। আইজ দুই মাসতো তার ঘাড়েই ছিলাম। এখন ও পারে না, কি করবে?

সীমা—আমাদের একটু থাকতে দিত; আমরা ক্যাম্পে কার্ড করে রেশন এনে চালাতাম। কষ্টতো করতেই হবে। আমরা সুখশান্তি চাই নাই। এ ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে কষ্ট তো করতে প্রস্তুতই আমরা। তা'ছাড়া কাকাতো স্পষ্ট করে একটা কথাও বলতে চায় নি। শুধু তুমি যখন জানতে চেয়েছো, তখন বলেছে, ক্যাম্পে যাওয়াই ভালো। বড় ছেলেটি খপ করে বোনের কথার মাঝখানে যেন লাফিয়ে পড়ল। সে বল্লে, বাবা ভেবেছিল, ভাইটি মুখ দিয়ে আমাকে না বল্লে আমি যাব না, একথা শুনে ভাইটি দাদাকে কিছুতেই যেতে বলতে পারবে না। কিন্তু বাবা বুঝতে পারে নি যে, অমন মুখের পরেই বলে দেবে।

আমার বুঝতে বাকী থাকল না যে, ছোট ভাইটি শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট করেই দাদাকে ক্যাম্পে যেতে বলে দিয়েছে।

সীমা—এইতো দেখুন, পূজা এসে গেছে। এখানকার ছেলেমেয়েদের কতো আনন্দ! নতুন নতুন জামাকাপড়ের কী ছড়াছড়ি! আর এই বাচ্চা-গুলোর দিকে তাকান তো? কাকা পারতো না ছোট দুটোকে কিছু দিতে।

বিপিন—কেন, আমরা আসার পরে অগো দ্যায় নাই?

সীমা—দিছে, তখন ওরা একেবারেই উলঙ্গ ছিলো, তাই দিছে।

বিপিন—দ্যাখ সীমা, শুধু দোষারোপ করিস না। তখনতো সবাইরেই কিছু কিছু দিছে। আমাকে ধুতি, তোরে ও তোর মারে শাড়ী, অন্য সবাইরে কিছু না কিছু দিছে।

স্ত্রী—সে ধুতিখানা আসার সময় খুইল্যা রাইখ্যা আসলা কেন?

সীমা—জানেন, বাবা মুখে যাই বলুক না কেন, অন্তরে এতো ব্যথা

পেয়েছে যে, আসার সময় দেখলাম, ভাইর দেওয়া ধুতিখান খুলে ভাজ করে আলনার উপর রেখে দিল, পরলো ঐ লুঙ্গি খানা।

বিপিনবাবু এবারে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

সীমা—ঐ যে বাড়ী, ও-বাড়ী কার টাকায়? বাবা পনর হাজার পাকিস্তানী টাকা পাঠায়। তখন পাকিস্তানী টাকার দাম এখানকার টাকা থেকে অনেক বেশী ছিল। তাই দিয়ে ঐ বাড়ী।

স্ত্রী—বাড়ী হইলো, তারপর ল্যাখলো, দাদা, পায়খানা বাথরুম হইল না। অমনি আবার দ্যাড় হাজার টাকা পাঠাইল। এক বছর পরে আবার ল্যাখলো, দাদা, বারেন্দার গ্রীলটা করতে পাল্লাম না। অমনি রামচন্দর দাদা পাঠাইয়া দিল পাঁচশো টাকা। সেই টাকাগুলা থাকলে আইজ আমাগো এমন দুর্দশা হয়।

বড় ছেলে—আজ বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠতে হবে। টিকিট কাটার পয়সাটাও নাই। এমন নিঃস্বরিক্ত হয়ে এতোবড়ো একটা পরিবার কি বাঁচতে পারে?

আমি বল্লাম—না, তা পারে না, ভাই। কিন্তু হতাশ হওয়াতো মহাপাপ। কতো মানুষইতো আজ একেবারে নিঃস্ব হয়ে এপাড় বাংলায় এসেছে। আমরা বিশ্বাস করি, দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। তোমরা আবার ঘরে ফিরে যাবে। আবার তোমরা লেখাপড়া করবে। তোমাদের বাবা আবার তার পুরাণ ব্যবসা শুরু করবেন। তোমাদের কোন কষ্ট আর থাকবে না। তবে আজকে তোমরা ভীষণ বিপন্ন। বিপদের মধ্য দিয়েই মানুষের পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তো তোমাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে। আজকে সবাই মিলে বিপিন বাবুকে দোষারোপ করলে কী লাভ হবে? উনি নিশ্চয় কোনদিন ভাবেন নি যে ওনার গর্বের ভাইটি একদিন ওনার প্রতি এমন করবে। এমন দিনে ওনার মনটাকে আর ভেঙে দিওনা তোমরা।

বড়ছেলে—না, বাবাকে দোষারোপ করে কোন লাভ হবে না, জানি। কিন্তু জানেন, এতো আঘাত পেয়েছি যে, সামলাতে পারছি না। তাছাড়া কোথায় যে যাচ্ছি তা-ও জানি না। আর এ যাত্রার যে শেষ কোথায়,

সে ভগবানই জানেন। কষ্টতো অনেক করেছি। একমাস বিলের মধ্যে নৌকায় রয়েছি। মৃত্যু প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে ফিরতো। কত লোককে চোখের সামনে মরতে দেখেছি। হয়তো আমাদেরও মরে যাওয়াই ভালো ছিল। তা হ'লেতো এতো লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো না।

বিপিন—আচ্ছা, সতুবাবু, ইয়াহিয়া সরকারতো বিশটা অভ্যর্থনা শিবির খোলছে। যারা ফির‍্যা যাবে, তাগো রিসিভ করবে। তা আমরা যদি ফির‍্যা যাই, তয় কেমন হয়?

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বল্লাম, খবরদার, অমন কাজটি চিন্তাও করবেন না। ফিরে যাওয়া মানে বুঝেন তো? একেবারে হাতে হাতে মৃত্যুবরণ।

বিপিন—নিজের জন্য আর কোন দুঃখই নাই। মানুষতো বাঁচার জন্য কত চেষ্টা করে। কিন্তু আমার এখন বাঁচার জন্য এট্টুও ইচ্ছা নাই। তবে হাঁ, আমার সামনে, এ্যাগো সবাইরে গুলি কইর‍্যা মারবে, তা সইতে পারবো না। আমার কাছে এখন বাঁচা আর মরার মধ্যে কোন তফাৎ নাই। বরং মইর‍্যা গেলেই ভালো!

স্ত্রী—মরবে সবাইই। যে-অবস্থায় আমরা পড়ছি, তাতে বাঁইচ্যা থাকার কোন লক্ষণই ছাখতে পারছি না। লবণ হ্রদে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সেখানে এখন কার্ড ছায় না। কোনো জাগা নাই। কি করবো যাইয়া সেখানে? আর এই বড় মাইয়া তো শত্তুর। এয়া লইয়া কোথায় যে যাইত্যাছি।

সীমা—দেখুন দাদা, যখন বুঝলাম যে, কাকার বাসায় আর থাকা যাবেই না, তখন নিরুপায় হয়ে কাকীমাকে একদিন মুখ ফুটে বললাম, কাকীমা, আর সবাই না হয় ক্যাম্পে যাক; আমি অন্ততঃ এখানে থাকি। যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়, ততদিন কাজের বৌটাকে তুলে দাও।

স্ত্রী—তাওতো রাজী হইল না।

আমি বললাম, একথায় রাজী হ'ল না কেন?

সীমা—কাকীমা বললেন, তাও কি সম্ভব! লোকে তাহলে বলবে কি? তাছাড়া কাজের বৌটাইবা যাবে কোথায়?

বড়ছেলে—তাহলে দেখুন দাদা, একটা ঝি-এর কথা কাকীমা ভাবেন ; অথচ আমাদের কথা তার ভাবতে একটুও ইচ্ছা করে না। এখানেই আমাদের দুঃখ। আমরা যেটা বোধ করছি, সেটা হ'ল কাকা ও কাকীমার আমাদের প্রতি সহানুভূতির অভাব।

বিপিন—আমি তা মনে করি নাই। সহানুভূতি তার ঠিকই আছে। কিন্তু সমস্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি তার সহানুভূতি প্রকাশের পক্ষে অনুকূল নয়।

তিন চার জন সমস্বরে প্রতিবাদ করে বললো, মিথ্যা কথা। কাকার নিজস্ব বাড়ী, ভালো চাকরি, মোটা অংকের বোনাস পেয়েছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে। আর তোমার মত পিতৃতুল্য দাদার জন্য তার সর্বস্ব ত্যাগ করা উচিত ছিল।

স্ত্রী—আচ্ছা তোমার টাকায় বাড়ী হইল, অথচ তোমার নামটা দলিলে থাকলো না কেন ?

সীমা—সে তো কাকা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, দাদা তুমি পাকিস্তানে থাকো, তোমার নাম দিলে কখন কি আইনগত অসুবিধা হয়, তাই তোমার নাম দেই নি।

বড়ছেলে—কি সুন্দর ব্যাখ্যা ! নাম দেয়নি, আমরা থাকতেও তো পারলাম না। বাবার টাকায় বাড়ী, অথচ সে বাড়ীতে আমাদের কোন অধিকার নাই। না, এসব আর ভালো লাগে না। এসব আলোচনা করতেও খুব খারাপ লাগে।

ট্রেন বন্ধ থাকায় প্লাটফর্মগুলোয় ভীড় উপচে পড়ছিল। কিন্তু ভীড় যতই বাড়ুক না কেন, লোকজনকে এদের কেন যেন সংকোচই ছিল না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন সরল-সহজ হয়ে পড়ে এরাও ঠিক তাই হয়ে পড়েছিল। একদিন যাদের মোটামুটিভাবে সবই ছিল, আজকে তাদের কিছুই নেই। যে ভায়ের জন্য ভদ্রলোক প্রাণপাত করেছেন সে ভাইও আজ কত দূরের মানুষ। কেন যেন আমার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো এমন সময় হঠাৎ মাইকে ঘোষিত হল, যাত্রী-বিক্ষোভ উঠে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। এবারে ডাউন ব্যারাকপুর

লোকাল ২নং প্লাটফর্মে আসবে। মুহূর্তে পরিবারটি জীবন্ত হয়ে উঠল। যে যার বোঝা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো, আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বিপিনবাবু বললেন—

সতু বাবু, আপনার কথা চিরদিন মনে থাকবে।

—আমিতো আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি।

—তবু আপনার তো একটা সহানুভূতি ছিল আমাদের পরে। এটার মূল্যও তো কম নয়।

—আমি যাব একদিন সল্টলেকে আপনাদের খবর নিতে।

—লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কি আমাদের খুঁজে পাবেন?

—চেষ্টা করবো, আপনারা কেমন থাকেন, এটা জানার আগ্রহ কতখানি তাতো নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

সীমা বললে, আপনি হয়ত যেতে পারেন; কিন্তু কাকা ঐ নরকে কোনদিনই যাবে না।

বিপিন—ট্রেন বোধ হয় এসে গেল।

আমি বললাম, বারাকপুর লোকাল তো, খুব বেশী ভীড় হবে না। তাছাড়া আমি তো আছি, আমি আপনাদের তুলে দেবই। আপনারা দরজার কাছেই থাকবেন। উল্টোডাঙা স্টেশনে নেমে যাবেন। ওখানে অনেকে নামবে তো, কাজেই ভেতরে থাকলে আপনারা নামতে পারবেন না।

এমন সময় দূরে ট্রেন দেখা গেল। বিপিনবাবু কেমন শিশুর মতো আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, কিছু বলবেন?

—দেখুন সতুবাবু, সবাই যা-ই বলুক না কেন, ভাইডির বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। নিজের বোঝা নিজেরই বওয়া উচিত। নিজের বোঝা অন্যের মাথায় দিলে তাতে কোনো গৌরব নাই। দাদা হিসাবে আমার কাজ আমি করছি। ভাইডির যা ভালো মনে হইছে ভাইডি তা করেছে। এর বেশী আর আমার কিছু বলার নাই।

—আপনার ভাইটি কি ঠিক কাজ করেছে বলে আপনার ধারণা?

ঠিক বেঠিক বুঝি না। তবে ভাইডি সুখে থাউক, এটাই আশীর্বাদ করি। তার এট্টা ছাওয়াল-মাইয়া হয় নাই, এজন্য তার খুব দুঃখ। বৌমারও সেজন্য খুব ব্যথা। আবার যদি কখনও আসি, তখন যেন দেখি, অগো এট্টা ছাওয়াল হইছে।

—সে ভালো।

এই সময়ে ট্রেন একেবারে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম, এক্ষুণি এদের তুলে দিতে হবে। বিরাট যন্ত্র-দানবটা এদের বুকে পুরে নিয়ে দিগন্তে-মিলিয়ে যাবে। বিশাল জনসমুদ্রে এই পরিবারটি বুদবুদের মতোই মিলিয়ে যাবে। আর কোনদিন হয়তো এদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। আর আমার দিদির বাসার পেছনে ঐ সুন্দর ঝকঝকে বাড়ীটিতে বিপিন বাবুর ছোট ভাই নিঃসন্তানা স্ত্রী, চাকুরি, আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাবে। অথচ একই মাতৃজঠর থেকে এ'দুটি ভাই এ পৃথিবীতে এসেছিলো। আজ এ দু'জনের মধ্যে কতই না দূরত্ব। আমি বললাম—

কি কুক্ষণে যে '৪৭ সালে দেশ ভাগ হ'লো?

—সতুবাবু, দ্যাশ ভাগতো অভিশাপ আনছেই। তবুতো দ্যাশ ভাগ এক রকম মাইন্যা নিচ্ছিলাম। কিন্তু সবচাইতে সর্বনাশটা কোথায় হইল জানেন?

—কোথায়?

—এই যে মনও ভাগ হইয়া গ্যাল!

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করে অশ্রু বিন্দুগুলো বেরিয়ে এলো বিপিনবাবুর চোখ থেকে। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাকলাম। সীমা খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—

—বাবাকে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি।

●

নরকং ব্রজেৎ

খবরদার! নিমাই, এমন চিন্তা মাথায় আনিস না। তোর বাপের মত লোক হয় না কি? অমন ভালো লোক দেহরক্ষা কল্লো, আর তুই কিনা তার ছেরাদ্দটা করবি না। হায় কলিকাল!

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চোখমুখে একটু জল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি পাশের গ্রামে একটা জরুরী প্রয়োজনে। পাড়াটা ছাড়াতে গিয়ে পুরুত বাড়ীর পুকুর পাড়ের সরু পথ যখন পেরিয়ে যাচ্ছি তখন পুকুর পাড়ের বাইরে, মাঠের মধ্যে যেখানে বাঁশগুলো একেবারে হেলে পড়েছে তার তলায় দাঁড়িয়ে সতা পুরুত নিমাই শীলকে বুঝাচ্ছিলেন। দিন ৬।৭ আগে নিমাই-র বাবা মারা গেছে। তার গলায় ধড়া, পরিধানে উত্তরীয়, উস্কখুস্‌খ চুল, বগলে একটা ছোট কুশাসন ও হাতে একখানা আসশেওড়ার লাঠি। পুরুত ঠাকুর প্রাতঃক্রিয়া সমপন্ন করে বাঁশঝাড় থেকে গাড়ু হাতে সবেমাত্র বের হতেই নিমাইকে যেতে দেখে ধরেছেন। কথাটা প্রথমে একটু চাপা চাপা ভাবে কানে এলেও গতকাল থেকে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে যে, নিমাই তার পিতৃশ্রাদ্ধ করবে না। সমাজবদ্ধ পল্লীজীবনে পুরুষানুক্রমিক জীবনধারায় এটা একটা ব্যতিক্রম, বিদ্রোহও বলা চলে। অনেকেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। পুরুত ঠাকুরতো একেবারেই মানতে পারেননি। তাই তাকে ভোরবেলা এ অবস্থায় পেয়েই ধরেছেন। নিমাই মাথা নীচু করে ছু'একটা জবাব দিচ্ছে। পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। পুরুত ঠাকুর একটানা বলেই যাচ্ছেন। আমি যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে তিনি উৎসাহিত বোধ কল্লেন, মনে হলো।

ছাখ নিমাই! মা-বাপের কাজ কইর‍্যা কেউ মারা পড়ে না। যে-বাপ তোরে পৃথিবীর আলোর মুখ ছাখাইলো, যে-বাপ এতো কষ্টে তোরে বড় কইর‍্যা তোল্ল, তুই তার ছেরাদ্দডা করবি না ক্যানরে?

—না, মানে, আমিতো ছেরাদ্দ করবো না, তাতো কই নাই।

—তয় তুই কী কইছস ?

—আমি কি দিয়া ছেরাদ্দ করবো ? আমার জন্য বাবা কি কিছু থুইয়া গ্যাছে ? কিছু নাই ঠাকুর গোঁসাই !

—শোন ভোলা, নিমাই-র কথা শোন ! নাই ? না থাকলে পিতৃশ্রাদ্ধ হবে না ?

—কিভাবে হবে ?

—তোর যেমন জোটে তেমন করবি। আমাদের শাস্তর খুব উদার। যে যেমন লোক সে তেমন কাজ করবে। দশ টাকায়ও ছেরাদ্দ হয়, দশ হাজার টাকায়ও হয়। তোর নাই, তুই দশ টাকার কাজ করবি।

—দশ টাকায় কি আর ছেরাদ্দ হয় গোঁসাই !

—হয় ! হয় ! তুই বাগড়া দিস না। শোন্, শ্রদ্ধয়া কৃত, ইতি শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা করা হয়, তাই-ই ছেরাদ্দ। যা, আর কথা বাড়াবি না।

—না, গোঁসাই, দশ টাকাও জোগাড় করার ক্ষ্যমতা নাই আমার। ছাওয়াল-মাইয়াগোই খাওয়াইতে পারি না।

—আবার তোর সেই কথা ! ছ্যাখ, তুই তো লেখাপড়া করস নাই, শাস্তরও পড়স নাই। আমাদের শাস্তরে আছে, পুৎ নামক ভয়ঙ্কর নরকেথ্যা যে উদ্ধার করে সে হইল পুত্র। পুৎ উপপদে, ত্রৈ ধাতু, ড প্রত্যয় কইর‍্যা হইল পুত্র। তয় তোর বাপরে তুই পুন্নরকেথ্যা মুক্ত করবি না ? অ্যাঁ !

—তুই কী কস ভোলা ?

নিমাই ফ্যাল ফ্যাল করে পুরুত ঠাকুরের মুখের দিকে তাকায়। আমার দিকেও সে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। সে যেন জানতে চায়, ওঁর কথার মধ্যে কোন ফাঁকি আছে কি না।

আমি ওর শুষ্কপাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে ওর অসহায়তার কথা ভাব-ছিলাম। বল্লাম, পুরুত ঠাকুর কইলেন, বাবার কাজ তো, যদি পারো করবে।

—পারিতো না। কোন উপায় ভাখি না।

—পারি না, পারি না, করবি না। পারস, এট্টু কষ্ট কল্লেই পারস। আর শোন, আমি ছেরাদ্দের দরকারী জিনিস-পত্তর সব দেব। তুই খালি কয়ডা আতপ চাউল, কয়ডা পাকা কলা আর এট্টু আউখী গুড় যোগাড় করবি।

নিমাই তবু মাথা নীচু করে থাকে। আর দেরী করা সম্ভব নয় দেখে আমি পা' বাড়ালাম। দূর থেকে শুনতে পেলাম, ছেরাদ্দ ছাড়াতো নরকং ব্রজেৎ। ছেরাদ্দ করবি না, বাপ নরকে যাবে। পুত্তুর হইয়া তুই চাস যে, বাপ নরকে যাউক? অ্যাঁ?

... ...

মাস তিনেক পরের কথা। কি একটা প্রয়োজনে সত্য পুরুতের বাড়ী গেলাম। দেখলাম, তিনি বারান্দায় একখানা আসনে বসে আছেন। জনা চারেক লোক একদিকে জড়সড় হয়ে বসা। পুরুত ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, ওঁর ছেলে ধীমান লিখছে।

ষোড়শের জন্য ছাতি ষোলটা। পাটী ষোলটা। চাদর ষোলখান। খড়ম ষোলজোড়া। তোশক ষোলখান। মশারী ষোলখান। বালিশ ···

তারপর একদ্দিষ্টের জন্য সাদা কাপড়······

ধীমান নিবিষ্ট মনে লিখছে। মাঝে মাঝে পুরুত ঠাকুর শ্রাদ্ধের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তব্যও রাখছেন।

এয়ার নাম বিষোচ্ছুগ্‌গো। এ কী যে সে কথা! ধেনু দান, ভূমি দান, স্বর্ণ দান। রাজারাজড়ারা আরও কত কি দান করে মা- বাবার নামে। তোগো অবস্থা ভালো। ভগবান তো আর তোগো কিছু খারাপ রাখে নাই। করবি না ক্যান? ভালো কইর‍্যা মার ছেরাদ্দডা করবি। আহা! বিষোচ্ছুগ্‌গো কয়জনের ভাইগ্‌গে হয় রে! আর তোর মা ছিল সতী-লক্ষ্মী।

—ল্যাখ। মুগ ডাইল ৬ সের, খেসারী ৬ সের, পাকা কলা দুই পোণ, পান দুই পোণ।

আমি চুপ করে বারান্দার এক পার্শ্বের বেঞ্চিটার ওপর বসে রইলাম। কর্দপর্ব শেষ হলে লোকজন চলে গেল। ধীমানও ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

আমি আমার প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে ফিরে আসছি। কিন্তু পুরুত ঠাকুরের কথা আর শেষ হয় না। তিনি তার পুত্রটি সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত। ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ছিলো। সম্প্রতি বি, এ, পাশ করে একটি সরকারী চাকরী করে। এক মহকুমা শহরে থাকে। ছুটিছাটায় বাড়ী আসে। সে খুব ধীরস্থির। কথাবার্তাও কম বলে। সুন্দর চেহারার ছেলেটিকে দেখলে প্রাণ জুড়ায়। যে-কোন বাবার পক্ষেই এমন ছেলে গর্বের বস্তু। বিভিন্ন কথার মধ্যেই পুরুত ঠাকুর ধীমানের প্রসঙ্গ টেনে আনেন এবং পরোক্ষে তার প্রশংসা করে ফেলেন !

ক' দিন পরে পাশের গ্রামে ঘোষাল বাড়ীতে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি, শ্রাদ্ধের সাজান বেদীর ওপর সত্য পুরুত মাথায় গামছা জড়িয়ে একটা রূপান্তরিত চেহারায় বসে বৃষোৎসর্গ কচ্ছেন। বহু জিনিস, অনেক প্রাপ্তিযোগ। আমি কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। এক ফাঁকে তিনি গলাটা খাটো করে আমাকে ডাকলেন—

দ্যাখ ভোলা, রাজবাড়ীর কাজ। ঘোষাল-মশাই সগ্‌গে যাবেন। দান-সাগর ছেরাদ্দ। যেমন ভালো লোক ছিলেন, ছেরাদ্দটাও তেমন কল্লো। এট্টা গাভী যে দিচ্ছে তাতে দুধ হয় পাসসের।

বলেই একটা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। আয়োজন দেখে আমিও খানিকটা অবাক হলাম। এমন শ্রাদ্ধ তো এর আগে কখনও দেখিনি।

সত্য পুরুত মানুষের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য ভাবেন। লোকে বলে, ওসব বুজরুগি। আসলে শ্রাদ্ধটা হলে উনি কিছু পাবেন, এজন্যই ওনার এত মাথাব্যথা দেখানো। সে যে-যা বলুক না কেন, আমার ধারণা, উনি সত্যি মৃত মানুষের মুক্তির কথা ভাবেন। আর তাইতো অপমৃত্যুতে তিনি চারদিনে শ্রাদ্ধের বিধান দেন। মৃত ব্যক্তির লাশ পাওয়া না গেলে কুশপুত্তলিকা দাহ করে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দেন। কারোর শ্রাদ্ধ বন্ধ

হয়েযাচ্ছে দেখলে, উনি যেন অস্থির হয়ে ওঠেন। কোথাও কোথাও খুব সামান্ত পেয়েও তিনি পৌরোহিত্য করেন। শ্রাদ্ধ না হলে মৃত ব্যক্তির যে মুক্তি হয় না, এ ধারণা তাঁর মজ্জাগত।

সত্য পুরুত আমাকে কেন যেন একটু স্নেহ করেন। তাই সেবার একজন এসে ধরলো, তার বাপ মারা গেছে, পুষ্করা পেয়েছে। পুষ্করা-শান্তি করা দরকার। অথচ দারুণ অভাবে তার সংসার অচল। কি উপায়ে এ দায় থেকে মুক্ত হতে পারে? তাই আমার কাছে আসা। আমিও গিয়ে ধরলাম পুরুত ঠাকুরকে। সব শুনে তিনি বল্লেন—

—ভোলা, তুই তো আইছস, পুষ্করাশান্তি খুব কঠিন কাজ। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস যে, আমার কাছে নাই। তাতো যোগাড় করতেই হবে। তবে আমি কথা দিলাম; আমারে কিছু দিউক আর না দিউক, কিছু চিন্তা নাই। না হয়, আমারে যেন এট্টা তামার পয়সা দক্ষিণা দেয়, তাইতেই হবে।

পুষ্করাশান্তি হলো। একরকম খালি হাতেই, অথচ হাসিমুখে তিনি ফিরলেন। বল্লেন—

তবুতো লোকটার মুক্তি হইল। কী যন্ত্রণাডাই নইলে ভোগতো।

সাদাসিধে মানুষটিকে আমার ভালোই লাগতো। তাই মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেতাম; গল্প করতাম। কেমন একটা প্রাণের টান বোধ করতাম।

… … … … … …

দিন ৭।৮ বাইরে কাটিয়ে ফিরে বাড়ীতে পা' দিতেই শুনলাম, সত্য ঠাকুর চারদিন আগে হঠাৎ আহ্নিক করতে বসে সন্ন্যাস রোগে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। শুনেই মনটা বেজায় খারাপ হলো। একজন আত্মীয় বিয়োগের মতোই কঠিন আঘাত লাগলো।

শীতের অপরাহ্ণে সূর্য ঢলে পড়েছে। হু হু করে শীতের বাতাস বইছে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে পুরুত ঠাকুরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলাম।

কত কি ভাবছি। এইতো সেদিনও হাট থেকে একত্রে ফিরলাম, কত গল্প হলো। আজ আর তিনি নেই। বলেছিলেন, এবার অগ্রান মাসে নবান্নের দিন নেই, মাঘ মাসে নবান্ন করবেন। তা আর আয়ুষ্কালে কুলালো না। বহুদিনের বহু স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে এক সময় এসে ওঁর বাড়ীতে পৌছালাম। দেখলাম, বারান্দা জনশূন্য। কোথাও যেন জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। বেঞ্চিটার ওপর বসলাম। আহা! আজ আর পুরুত ঠাকুর হেসে কথা বলবেন না। জীবনের নশ্বরতার কথা ভাবছি, আর ভাবছি।

না, কেউতো নেই।

—তা ধীমান আছো নাকি? ও ধীমান!

মিনিট তিনেক পরে ধীমান বাইরে এসে দাঁড়াল। উত্তরীয় পরিধানে, গলায় ধড়া, শুষ্ক মুখ। আমি খুব কষ্টে উদ্গত অশ্রু দমন করলাম।

—তা তোমাকে আজ এ কাপড়ে দেখবো তাতো ভাবি নাই।

—ধীমান নীরব, নিরুত্তর।

—পুরুত ঠাকুর যে এভাবে ফাঁকি দিয়ে যাবেন, তা কখনো ভাবি নাই। সেদিনও একত্রে হাটেথ্যা আইলাম। মাঘ মাসে নবান্ন করার কথা কইলেন। কিন্তু হঠাৎ সব শ্যাষ!

—সময় হইলে আর রাখবো কিভাবে? ধীমানের শান্ত উত্তর।

—তাতো ঠিকই! সময় হইয়া গেলে কি আর কেউ থাকে, না কেউরে রাখা যায়? এ কথা সে কথায় সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো দেখে বল্লাম—

সন্ধ্যা তো হইয়া গ্যাল। পথও তো কম না। আমাকে তো উঠতে হবে। তয়, বাবা আইজতো চাইর দিন। মাঝখানে ছয়দিন। এগার দিনের দিন তো কাজ। তা কি চিন্তা টিন্তা করছো?

—কিসের?

—ক্যান্সের।

—কী কাজ?

—ক্যান? ছেরাদ্দের কাজ।

—ওঃ!

—তা কী ঠিক করছো বাবা?

—ছেরাদ্দ হবে না।

গম্ভীর গলায় উত্তর দিল ধীমান!

—সে কী! ছেরাদ্দ হবে না ক্যান? তোমার কি টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে?

—না না। তা না। এমনিতেই বলছি।

—ক্যান বলছ?

—ওসব আমার ভাল লাগে না।

—কারণ ?

—কারণ আবার কি? ইহকাল লইয়া মাথা ঘামাইয়াইতো কূল পাই না, আবার পরকাল লইয়াও মাথা ঘামাবো? এমন সময় নাই। সাধ্যই বা কোথায়?

—তুমি পরকাল মানো না!

—ইহকালটাইতো ভাল কইর‍্যা বুঝলাম না।

—তাইলে পুরুত ঠাকুরের ছেরাদ্দ হবে না?

অ্যাঁ? আমাগো পুরুত ঠাকুর অছেরাদ্দে যাবেন?

বল-কি ধীমান! ছেরাদ্দ করবা না?

—না।

—তয় উত্তরীয় পড়ছ ক্যান, গলায় ধড়াইবা লইছো ক্যান?

—নিতান্তই মানুষে সমালোচনা করবে তাই। আমার শরীর ভাল লাগছে না। আমি একটু বিশ্রাম করবো, কাকা।

বলেই ধীমান ভেতরে চলে গেল। আমি স্থানুর মত বসে থাকলাম। মনের মধ্যে অব্যক্ত যন্ত্রণা তোলপাড় করতে লাগলো। কখন সন্ধ্যার

অন্ধকার বারান্দাটা ঢেকে দিয়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এলো, অ্যাঁ! সন্ধ্যা হয়ে গেল, নীরক্ষীরটাও তো দেওয়া হল না। একবার ভাবলাম, ধীমানকে ডাকি। নীরক্ষীরটা দিতে বলি। এমন সময় একটা জোর বাতাসে আমগাছের একটা ডাল বারান্দার টিনের চালে একটা প্রবল ঘর্ষণ দিয়ে গেল। আমি চমকে উঠলাম। অ্যাঁ! বারান্দায় কেউ একটা আলোও দিলো না। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ীর উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে পা' বাড়ালাম। আবার একটা বাতাস এসে আর একটা শব্দ করলো। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম পুরুত ঠাকুরের গলা—

পুং-উপপদে ত্রৈ ধাতু-ড প্রত্যয় যোগে পুত্র। পুন্নামক নরকেথ্যো যে উদ্ধার করে, সে-ই হইল পুত্র।

অন্ধকারে আমি পথ ঠাহরকরতে পাচ্ছিলাম না। বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

—*—

ঃ আহ্বান ঃ

পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়েছিল ; আর দাবা খেলার শর্তানুসারে পঞ্চপাণ্ডবকে এক বছর অজ্ঞাতবাস সহ তের বছরের জন্য নির্বাসনে যেতে হয়েছিল ; কিন্তু কোন্ সত্য বা শর্ত পালনের জন্য কতদিন ধরে আমার এ নির্বাসন ? বনবাস শেষে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে গিয়েছিলেন. পাণ্ডবরা হস্তিনায় পেয়েছিলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু হায় ! এ জনারণ্য থেকে আমারতো প্রত্যাবর্তনের কোন পথই খোলা নেই। আমার বনবাস যাবজ্‌জীবন, বংশ পরম্পরায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবগণ বনবাস জীবনে প্রতিদিন সকালে উঠেই দিন গুণতেন দেশে ফেরার জন্য। আমিও প্রতিদিন সকালে উঠে আমার অযোধ্যা, আমার হস্তিনার কথা ভাবি। কিন্তু তফাৎ এই যে, দিন আমি গুনতে পারি না। যেখানে থাকতে পারলাম না, যেখান থেকে চলে আসতেই হলো, যেখানে ফিরে যাবার অধিকার পাচ্ছি না, যার কাছে ফিরে যাবার অনুমতি নেই, অন্তর থেকে তার কাছ হ'তে দূরে থাকার ছাড়পত্রও তো পেলাম না। এ এক দুঃসহ যাতনা ! এ এক অব্যক্ত বেদনা।

১৯৩৬, ডিসেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দের সাথে সরস্বতীর আরাধনা চল্‌ছিলো। থাকতাম মদনমোহন বসাক লেনে। কিন্তু সময় কাট্‌তো জগন্নাথ হলেই। এলো জানুয়ারী, ১৯৩৬। এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। ঢাকায় বিভীষিকাময় তেরটা দিন কাট্‌লো। অনেক আগুন, অনেক রক্ত, অনেক মৃত্যু দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হ'ল মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব সব আদিম যুগের হিংস্রতায় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

পড়াশুনার হ'লো ইতি। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়ই দিলাম সীমান্ত-পাড়ি। জীবনে হ'ল পট পরিবর্তন। নতুন পরিবেশে নতুন করে হ'ল

জীবনের সূচনা। প্রতিজ্ঞা করলাম, আর ফিরে যাবো না। যেমন করেই হোক এখানেই ঠেলাঠেলি করে হ'লেও ঠাঁই করে নিতে হবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, রক্ষা করা যে তত কঠিন এটা বুঝতে পারলাম না।

মাসীমার বাসায় গিয়ে উঠ্‌লাম। প্রাণ নিয়ে চলে এসেছি, এতে মাসীমা খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। আবার মা-কে ফেলে এসেছি বলে ক্ষোভ এবং দুঃখ কোনটাই চেপে রাখলেন না।

দিন পনের মুক্তির আনন্দ ও নতুন পরিবেশের আন্‌কোরা গন্ধে ভালোই কাট্‌লো। তারপর মাসখানেকের মাথায় স্তিমিত হয়ে এলো আবেগের বেগ। রূঢ় বাস্তব অতি ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগলো তার তীক্ষ্ণ দাঁতনখগুলো নিয়ে। মেসোমশাই একটু ধীরস্থির গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তার যেমন উচ্ছ্বাসের আতিশয্যও নেই, নেই তেমনই বাস্তবের বাড়াবাড়িও। কিন্তু মাসীমা কখনো উচ্ছ্বাসময়ী, আবার কখনও বা ঘোর বাস্তববাদী। কিন্তু গুটি দু'এক মাসতুতো ভাই ছিল, তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজই ছিল কারণে অকারণে আমাকে একটু-খোঁচা মেরে কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করা। খোঁচাগুলো আমার মর্মপীড়ার কারণ হলেও আমি সযত্নে আত্মরক্ষার জন্যে আঘাত বাঁচিয়ে চলতাম। কিন্তু দু'একটা খোঁচা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হতো। একদিন বড় মাসতুতো ভাইটি জিজ্ঞেস করলো—

—দাদা, ঢাকায় কি বাস চলে? আর একদিন ছোট ভাইটি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো—

—আচ্ছা দাদা, ঢাকায় এম-এ তে কি রবীন্দ্রনাথ পড়ায়?

এসব প্রশ্নের কি সদুত্তর দেব, আমি তা বুঝে উঠ্‌তে পারিনা। এরা লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো সম্পর্কে বহুকথা জানে। অথচ ঘরের পাশে ঢাকা সম্পর্কে কিছু জানে না? না সব জেনেশুনে আমাকে নিছক খোঁচা মারার জন্যেই এসব প্রশ্ন? অথচ আমার মেসোমশাইর জন্ম ও জীবনের অর্ধেকেরও বেশী সময়তো কেটেছে ফরিদপুর জেলায়। আর মাসীমা?

উনিতো খাস বরিশালেরই মেয়ে। এই মাসীমা-মেসোমশাইয়ের ছেলে হয়েও এদের এসব কি প্রশ্ন ?

আর একদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে 'দেশ' পত্রিকা থেকে একটা গল্প পড়ছিলাম। বড় ছেলেটি নীরবে পড়াশুনা করছিল। হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ডাকলো, দাদা,

—উঃ !

—আপনাদের পাকিস্থানে কি দালান আছে ?

আমি পত্রিকাটা ফেলে দিয়ে তড়াক করে উঠে বসলাম।

—তোমারতো বয়স কম হয়নি, বিমল। তুমি এরকম শিশুর মতো প্রশ্ন করতে পারো, এমনটিতো আমি ভাবিনি। তোমরা অনেক সময় অনেক প্রশ্ন করো, কিন্তু প্রশ্ন করার সময় একবারও চিন্তা করো না ?

—আপনি রাগ করলেন, দাদা ?

—না রাগ করবো কেন। হয় তোমরা শিশুর মতো অবোধ, আর না হয় কেবলমাত্র মজা করাই তোমাদের উদ্দেশ্য।

বিমল আর কোন কথা বললো না। সে মাথা নীচু করে বই-পত্রের মধ্যে ডুবে গেল। আর আমি শুয়ে পড়ে আবার পত্রিকাটা হাতে তুলে নিলাম। গল্পটা পড়ে যাচ্ছিলাম বটে ; কিন্তু মনটা আমার চলে গেল সেই মদনমোহন বসাক লেন, বামাচরণ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, রেলগেট, গুলিস্তান হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, তার ক্লাস ঘরগুলো, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকবৃন্দ, সহপাঠীদের অতি পরিচিত মুখগুলো, পুরানো এ্যাসেম্ব্লি হল, রেজিষ্ট্রারের অফিস ভবন, আর প্রাণপ্রিয় সেই জগন্নাথ হলে। ভাবলাম, দাঙ্গাতো কবেই শেষ হয়ে গেছে। ক্ষতগুলোও এতদিনে নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে, ক্লাস হচ্ছে। পরীক্ষাও এসে গেল। হলে হলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করছে। দেবেন, মতিন, রাজ্জাক, সেলিম, ভূপতি সবাই পরীক্ষার জন্য এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর আমি ? এই বৈদ্যবাটীর প্রান্তে, এই ছোট বাটীতে অপরের গলগ্রহ হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও বিশেষণহীন বর্তমান নিয়ে দিব্যি আছি। পরক্ষণে-ই মনে পড়লো বাড়ীর কথা। আমাদের গ্রামে এখন এমনি

করেই রাত্রি নেমেছে। অন্ধকার নিস্তব্ধ গ্রাম। যে গ্রামে একদিন তিনশো ঘরেরও বেশী লোক বাস করতো, আজ সেখানে মাত্র দশ-বারো ঘর লোক আছে। তাও সবকটি পরিবারেরই কিছুনা কিছু লোক এখানে চলে এসেছে। গ্রামটা কি ভীষণভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছে। সে জঙ্গল বিশ্রী ও বেপরোয়া। তাতে না আছে প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ মমতাময়ী রূপ, না আছে অরণ্যের ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্তমূর্তি। সে জঙ্গল হাপ-ছাড়া মাতালের মতো বিশ্রী। তা গ্রাস করতে চায়। সেখানে সাপ ও জন্তু-জানোয়ারের আড্ডা। মাঝে মাঝে দিনের বেলায়ও শেয়াল ডেকে ওঠে। রাত্রির নিস্তব্ধতা সেখানে ভয়ংকর। নিতান্ত কবিও এ নিস্তব্ধতা ভালোবাসতে পারেন না। সে গ্রামেরই একটা ঘরে 'মা' রয়েছেন। সেই যে ঢাকা থেকে চলে এসেছি, 'মা'র সাথে দেখা করেও আসতে পারিনি। প্রতিদিন মা আগমন প্রত্যাশা করেন। আর আমি যাতে কিছুতেই ফিরে যেতে না হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। এই ক'মাস ধরে চাকরির জন্য কত চেষ্টাই না করলাম ; কিন্তু কিছুই হ'লো না। মেসোমশাই গোটা চারেক টিউশনি ঠিক করে দিয়েছেন। সকাল-বিকেল তাই করি। পরিশ্রম করি অনেক, পারিশ্রমিক পাই কম। ছেলেরা বেকার টিউটরের কাছে পড়তে চায় না। স্কুল-শিক্ষকের কাছে পড়লে অনেক লাভ। আমার আবার একটি ছাত্র একদিন প্রশ্ন করে বসলো, 'আপনিতো মাস্টারমশাই ওখানকার পাশ ! হঠাৎ এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের কারণ কি ? আর কিইবা এর উত্তর দেব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ছেলেটির প্রশ্নের মধ্যে কোথায় যেন একটুখানি কিসের ইঙ্গিত ছিল। আমি কিছুই না বলে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমার মাসতুতো ভাইদের মতো এদেরও মনে হয় একটা কমপ্লেক্স আছে। কিন্তু আমার তো এসব কমপ্লেক্স, টমপ্লেক্স নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

আজ ক'দিন থেকে ভাবছি, কলকাতা ইনভার্সিটি থেকে এম, এ পরীক্ষাটা দিতে পারলে হতো। মাথার মধ্যে যখনই চিন্তাটা এলো, তখনই সেটা খুব দ্রুত নানাভাবে পল্লবিত হয়ে উঠলো। খোঁজ খবর

নিয়ে জানলাম, আধমাইল খানেক দূরের একটি মেয়ে ইন্‌ভার্সিটিতে পড়ে। ঠিকানাটা যোগাড় করে রবিবারের একটা সকালে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একেবারে গ্রাম অঞ্চল। কিছু দিন হয় এ কলোনিটি গড়ে উঠেছে। এ বাড়ী ওবাড়ী করে শেষ পর্যন্ত একটা বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এক বয়স্ক ভদ্রলোক ময়লা কাপড় পরা, গলায় ময়লা পৈতে। দু'হাঁটুর মধ্যে একটা প্লাষ্টিকের বালতি রেখে গাভী দোহন করছেন। এবং উঠানের একপ্রান্তে এক বুড়ো ভদ্রমহিলা বঁটির ওপরে বসে দ্রুত খড় কাট্‌ছেন। বাড়ীতে চার পাঁচটি গাভী। মনে হয় গরুর দুধ-ই এদের জীবিকা। ছোট একখানা টালির চাল দেওয়া ঘর এবং মাটির মেঝে। বারান্দায় একখানি চৌকির পরে বসে বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ে কি যেন লিখছে। মনে মনে ভাবলাম, এ মেয়েটিই হয়তো ইনুভার্সিটিতে পড়ে। আমি আস্তে আস্তে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেলাম। পড়াশুনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ করবো বলে তাকে জানালাম। উনি বললেন—

—যাও যাও, ঐতো নিরু। কথা বলো গিয়ে। আমি বারান্দার কাছে এসে দাঁড়ালাম। বিনীতভাবেই বল্‌লাম, দেখুন, আপনার কাছে আমি একটু এসেছিলাম।

নিরুপমা মুখ তুলে তাকালো। বল্‌লাম, ঢাকায় পড়তাম। জানুয়ারী থেকে তো পড়া বন্ধ। চলে এসেছি। শুনলাম, আপনি কলকাতায় পড়েন। আচ্ছা! বল্‌তে পারেন, আমার এখান থেকে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা?

—ও, আপনি পাকিস্থান! আমি বল্‌লাম, না, আমি পাকিস্তান নই। আমি পাকিস্তানে থাকতাম। মেয়েটি মাথা নীচু করেই আবার লিখ্‌তে লাগলো। আমি বুঝলাম, উনি একটু লজ্জাও পেয়েছেন, বিরক্তও হয়েছেন।

দু'জনেরই নীরব অবস্থায় মিনিট দু'য়েক কেটে গেল। প্রয়োজন আমার। তাই নীরবতা আমাকেই ভাঙতে হলো।

—আপনি কি আমাকে এ ব্যাপারে ইন্‌ভার্সিটি থেকে একটু জেনে দিতে পারেন ?

—দেখুন, এসব জিনিষ নিজে গিয়ে এন্‌কোয়ারি সেক্‌সান থেকে জেনে আসা ভালো।

—আচ্ছা, তবে আসি।

—প্রতিপক্ষের কোন উত্তর এলো না। আমি ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল, আহা! কত আশা নিয়ে এসেছিলাম, একটা ভালো খবর পাবো বলে। তারপর নতুন উদ্যমে নেমে পড়বো। কলকাতা থেকে এম, এ পাশটা করতে পারলে তখন একটা কিছু হবেই। এখন যেমন একটা চাকরির জন্য লাটিমের মতো ঘুরছি, তখন হয়তো একটুখানি সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে এসে একটি সামান্য কথায় কি রকম সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। এ পরিবারটি নিশ্চয়ই পাকিস্তান থেকে আসা উদ্‌বাস্তু। কি. কষ্টেই না এদের জীবন ও জীবিকা চলে। আর এই মেয়েটির প্রতি আমার কতই না শ্রদ্ধা। কারণ এতো প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে সে এম, এ, পাশ করতে যাচ্ছে। এতদূর থেকে ইন্‌ভার্সিটিতে তার ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করতে হয়। হয়তো পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি টিউশনিও করতে হয়। যার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা আমার মনের মধ্যে জড় হয়েছিলো, সেই কি না আমার প্রতি ঐরকম একটা অবজ্ঞার ভাব দেখালো। আবার ভাবলাম, আহা! মেয়েটির এত কষ্ট-ক্লেশে গড়া জীবন, তবু ক্লেশ ও মুখখানাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মুখটি কি মিষ্টি! চোখ দু'টো কি স্বপ্নালু! ও কি ইচ্ছে করেই আমাকে আঘাত করলো, না ও এর গুরুত্ব আদৌ বোঝেনি। না সবটাই আমার একটা কম্‌প্লেক্স? আমিই কি কম্‌প্লেক্সে ভুগ্‌ছি? মেয়েটি লজ্জা পেয়েছে, সংকুচিতও হয়েছে। হঠাৎ পা' থামিয়ে দিলাম। ভাব্‌লাম, ফিরে যাই, নিরুপমাকে গিয়ে বুঝিয়ে বলি, আমার আচরণের জন্য আমি লজ্জিত। আবার পরক্ষণেই ভাবলাম, ছি! তাও কি কখনও হয়। ও যদি আমার ফিরে যাওয়াটাকে অন্য কিছু বলে ধরে ?

তারপর হন হন করে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ছুটে যাই, কি করবো পরামর্শ নেওয়ার জন্য। কেউ বা সহানুভূতির সাথে আমার সব কথা শোনেন। বিজ্ঞের মতো ভয়াবহ বেকার সমস্যা এবং আগামী দিনগুলির আরও জটিল রূপটা কিভাবে প্রকট হয়ে উঠ্‌বে তার একটা ছক তুলে ধরেন। কেউবা বলেন, এদেশের ছেলে-মেয়েরাই বেকার, তুমি তো বাপু ঢাকার। তবে তোমার কিছু হওয়াতো কঠিন। কেউবা বলেন, চিন্তা করো না, চেষ্টা চালিয়ে যাও, একদিন না একদিন একটা কিছু জুটবেই। ওদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এদেশে এসেছে। অনেকেই একটা না একটা কিছু জুটিয়ে নিয়েছে। না খেয়ে মরে গেছে এ রকম বড় একটা ঘটেনি। তবে কি হয়েছে জান, কেউবা অনেক বড় ছিল, এখানে এসে ছোট হয়ে গেছে; আবার কেউবা ওখানে নীচুতে পড়েছিল, এখানে এসে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা ওপরে উঠে গেছে। এখানে সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। এখানকার জীবনই সংগ্রামী জীবন। পূর্ববাংলার সরল-সহজ জীবন যাত্রা এখানে অচল। আবার কেউ কেউ বা মুখের পরেই বলে বসেন, এখানে কিছু হবে না, ফিরে যাও। ওদেশে চাকরির বাজারটা এখনও এত জটিল হয়নি। কেন এখানে শুধু শুধু পস্তাবে? আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাবি, বিপদ-আপদ এসব এযুগে কোন্ দেশেই বা একেবারে নেই? আমি শুনে শুনে কখনও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ি, আবার কখনও আশায় বুক বাঁধি। পরিশ্রমকে আমি ডরাই না, আলস্যকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। কিন্তু সত্যি-কারের কোন পথের সন্ধান আমি পাই না।

মাঝে মাঝে মায়ের চিঠি আসে দেশে ফেরার তাগিদ নিয়ে। বন্ধুরা চিঠি লেখে ঢাকা ফেরার জন্য। আমি মাঝে মাঝে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে উঠি—

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!

সেদিন একটা আপিস থেকে ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরছিলাম। কিছুতেই হ'লো না বলে একটা হতাশা বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে কাঁটার মতো

বিঁধছিল। হঠাৎ দেখলাম, একটা বড় মিছিল রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিরাট মিছিল। দ্রুত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের বলিষ্ঠ হাত উত্তোলিত, মুখে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার শ্লোগান। আমার শরীরে কেমন রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। রক্তের বেগ কেমন বেড়ে গেল। একবার ইচ্ছে হ'লো, আমিও ওদের সাথে মিশে যাই। কিন্তু পারলাম না। মনে পড়লো, ওখানে তো এমন প্রগতিশীল শ্লোগান কখনও শুনিনি, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন এমন করে প্রত্যয়ের সাথে সহস্র সহস্র কণ্ঠে সমবেত ভাবে উচ্চারিত হতে শুনিনি।

ক'দিন পরের কথা। আমি বিকেলে বাজারে যাচ্ছি কিছু কিনবো বলে। হঠাৎ দেখলাম, একটা কলোনীর প্রায় সব লোক যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা বাড়ীর দিকে। দু'এক জনকে জিজ্ঞেস করে যা জানতে পারলাম তা হ'ল এই—

জনাতিনেক দিন মজুর এক ধনীর বাড়ীতে সারাদিন জন খেটেছে। কিন্তু দিন শেষে ন্যায্য মজুরী না দেওয়ায় মজুরদের সাথে তার কথা কাটাকাটি ক্রমে বচসায় পরিণত হলে ওদের মারধর করা হয়। তাই সংবাদ পেয়ে গোটা কলোনী ছুটে যাচ্ছে প্রতিশোধের চরম উত্তেজনায়। ও বাড়ীতে বন্দুক আছে, একটা বড় রকমের কিছু ঘটে যেতে পারে জেনেও তারা ছুটে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, এ লোকগুলো সবাই একদিন সব কিছু ফেলে পূর্ববাংলা থেকে নিঃস্ব অবস্থায় এদেশে চলে এসেছে। আজও কত কষ্ট করে এ কলোনীতে এদের জীবন কাটে। তবু তিনজন লোকের জন্য সমবেদনা দেখাতে এরা কি ঐক্যবদ্ধই না হয়েছে। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক না কেন, এতগুলো লোকের সমবেত বিক্ষোভকে ভয় পেতেই হবে। ভাবলাম, পূর্ববাংলায় থাকতে এলোকগুলো কত শান্ত, কত নিরীহই না ছিল! রূঢ় বাস্তব আজকে এদের আর ক্ষুদ্র করে রাখেনি, রুদ্র করে তুলেছে। এই ভেবে খুব আনন্দ লাগলো যে, এদের প্রতি অন্যায় খুব বেশীদিন আর চলবে না। রাস্তার পাশ ঘেসে ঘেসে ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম, আর ভাবছিলাম। এখানকার সমাজ-

ব্যবস্থা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। একদিন হয়তো এখানে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা থাকবে না। মানুষ মানুষের মর্যাদায়ই বাঁচবে। এ প্রত্যয়টা কি ভীষণ-ভাবে যেন আমার মনটাকে নাড়া দিয়ে তুললো। সমাজ ব্যবস্থার সেই পরিবর্তিত অবস্থায় আমার মতো একজন লোকের অবশ্যই ঠাঁই হয়ে যাবে। আমি যেন নতুন করে নিজের ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করলাম। আর এই আবিষ্কার হতেই হতাশার গ্লানি থেকে মুক্তি পেলাম। দেহ ও মনে কেমন যেন নতুন শিহরণ বোধ করলাম।

টিউশনির পয়সা বাঁচিয়ে মাঝে মাঝে কলেজষ্ট্রীট যাই, বেছে বেছে ভালো দু'একখানা করে বই নিয়ে আসি। গো-গ্রাসে সেগুলো পাঠ করি? পাবলিক লাইব্রেরীতে কার্ড করে নিয়েছি। প্রতিদিন সেখানে গিয়ে আমার কাজ হ'ল বিদেশী খ্যাতনামা লেখকদের বই পড়া। এ বই পড়ার মধ্য দিয়ে যে আনন্দ তা ব্যাখ্যাতীত। এ নিঃসঙ্গ জনারণ্যে, এ ভীষণ জনস্রোতের মধ্যে নিষ্কর্মার প্রকৃত বন্ধু বই। ওরা না থাক্‌লে হতাশা হয়তো আনাকে একেবারে শেষ করে দিত।

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, মা আমাদের উঠানের টগর ফুলের গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর চোখে-মুখে ভীষণ উদ্বেগ। ঘুম ভেঙ্গে গেলে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। বিছানায় উঠে বসলাম। আলো জ্বেলে দেখ্‌লাম, রাত দু'টো। ভাবলাম, সকাল হলেই যে করেই হোক মায়ের কাছে ফিরে যাবো। এখানে আমার কিছু হবে না। এখানে হতাশায় ভুগে ভুগে নিঃশেষ হয়ে যাবো। না পারি এখানকার লোকজনের সাথে প্রাণ খুলে মিশ্‌তে, না পারি একটা চাকরির সন্ধান করতে। শুধু শুধু মেসোমশাইর অন্ন ধ্বংস করি, আর ওদিকে মা কত উদ্বেগেই না পথ চেয়ে থাকে। মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া ভালো, মরীচিকার পিছনে না ছুটে মায়ের কাছে ছুটে যাওয়াই ভালো। প্রথমে বাড়ী যাবো। মায়ের কাছে ক'দিন কাটাবো, তারপর যাবো ঢাকা। দেবেন, মতীন, রাজ্জাক, সেলিম সবাইতো ঢাকায়ই আছে। কিসের চিন্তা? মৃত্যু ভয়? ও ভয়তো মানুষের চিরন্তন। আর ওতো একদিন সবার জন্যই অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। বিছানায় বসে বসে ভাবছি

আর ভাবছি, এমন সময় ঝেপে বৃষ্টি এলো। আমিও বিছানায় এলিয়ে পড়লাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন বৃষ্টিধৌত স্নিগ্ধপ্রভাত। কি মিষ্টি মিষ্টি রোদ্দুর। হঠাৎ মনটা খুশিতে ভরে উঠলো, ভুলেই গেলাম গতরাত্রির সিদ্ধান্ত।

ইতিমধ্যে মেসোমশাই একদিন বললেন, কিরে শুভ্র, ইণ্টারভিউতো অনেকগুলো দিলে, কোথাও কিছু হলো কি?

—না মেসোমশাই, হলোনা কিছুই।

—আমার মনে হচ্ছে, ঢাকা ইনভার্সিটির লোকের এখানে কিছু হবেনা। তা দাঙ্গাটাঙ্গাতো অনেকদিন মিটে গেছে। তুমি ফিরে গিয়ে পরীক্ষাটা দিয়ে আসবে নাকি? দেখ, এম, এ-টা পাশ করে আস্‌তে পারলে তোমার অনেকটা পথ খোলা হয়ে যেত। উত্তরে আমি চুপ করেই থাকলাম। মাসিমা ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। মনে হয় তিনি দরজার বাইরেই প্রতীক্ষা করছিলেন; মাসিমা বললেন, কথাটা ক'দিন থেকে আমিও ভাবছি। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছিনা, শুভ্র যদি আবার কিছু মনে করে। দেখ বাবা, তোমার মা-ও দেশে পড়ে আছে, পঁই পঁই করে চিঠি লিখ্‌ছে। এখানেও কিছু করতে পারছো না। আমার মনে হয়, তোমার মা-র কাছে ফিরে যাওয়াই ভালো। হ্যাঁ। তবে ওখানে চিরদিন থাকতে পারবে না। এখানে তোমাদের আস্‌তেই হবে। তবে এভাবে হঠাৎ করে ঝাপ দিয়ে আসা নয়। এখন চলে যাও। এম, এ-টা পাশ কর। জমিজমা, ঘরবাড়ী বিক্রি কর। তারপর আস্তে আস্তে টাকাটা পাঠালে, আমরা তো আছি, তারপর একসময় মাকে নিয়ে চলে এলে। আমরা যখন আছি, তখন জলেতো আর পড়বে না। আমি কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাই একটু থেমে থেমে বললাম—

—হ্যাঁ, হঠাৎ করেই তো চলে আস্‌তে হলো, মা-ও দেশে রয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও এখানে কিছু করতে পারলাম না। তাই ফিরে যাবো

কিনা, আমিও ভাবছি ! আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই আমি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ক'দিন পরের কথা। দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত আমার পাকা হয়ে গেছে। কেমন একটা ঔদাসীন্যে আমার দিন কাটে। তিন চারদিন পরেই রওনা হবো। কাজেই কেমন যেন একটা দোটানা বোধ করছি। কখনও ভাবছি, ফিরে যাওয়া ছাড়া পথ নেই, আর ফিরে যাওয়াই ঠিক। আবার ভাবছি, এখানে আবার আমাকে একদিন আসতেই হবে। না এসে উপায় নেই। আর যখনই আসবো, তখনই ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো আমার অবস্থা হবে। যত পরে আসবো, পরিবেশ তত প্রতিকূল হবে। সমস্যা হবে তত জটিলতর, তাই না যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু যেতে আমাকে হচ্ছেই। তাই মনে মনে যুগপৎ বেদনা ও আনন্দ বোধ করছি। পেছনের টান ও সামনের আকর্ষণ, আমার যেন সমান হয়ে দেখা দিয়েছে।

অতঃপর সামান্য একটি চামড়ার ব্যাগ হাতে করে মাসিমা ও মেসোমশাইকে প্রণাম জানিয়ে বৈদ্যবাটীর বাটী থেকে একদিন সকালে যাত্রা করলাম। মাসতুতো ভাই বিমল ও কমল শিয়ালদা পর্যন্ত এলো খুলনা যাওয়ার গাড়িতে আমাকে তুলে দিতে। কালচে রঙের উর্দু লেখা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে নিঃশব্দে উঠে বসলাম। বিমল ও কমল বার বার জানালো যে, আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে তারা পাকিস্তানে যাবে। পদ্মা মেঘনার বুক দিয়ে তারা ষ্টীমার চড়বে, তাজা অথচ সস্তা ইলিশ মাছ খাবে, জল না মেশানো দুধ খেতে ওদের ভারী ভালো লাগে। আমিও বারবার ওদের যাবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানালাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। ওরা হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানালো। আমি চোখ বুজে বসে থাকলাম। পিছনে পড়ে থাকলো আমার দশ মাসের স্মৃতির টুকরো-গুলো ; পড়ে থাকলো আমার প্রিয় কলেজষ্ট্রীট, পাবলিক লাইব্রেরী, গুটি দুই ক্লাব, আরও অনেক পরিচিত মুখ। কেন যেন মনে হ'ল, ভুল করলাম, ভুল করলাম।

ট্রেন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বহু ষ্টেশন পেরিয়ে পড়ন্ত বেলায় বনগাঁ

ষ্টেশনে এসে সে থামলো। এখান থেকে গাড়ীর ইঞ্জিন পালটাতে হবে। তাই বেশ কিছু সময় এখানে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকবে। শিয়ালদা থেকে আসার পথে দু'পাশে কর্মমুখর জনস্রোত, উত্তুঙ্গ অট্টালিকা শ্রেণী, রেল-লাইনের পাশে দরিদ্রদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। পল্লী প্রকৃতির অজস্র ছবি চোখ মেলে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, এক'দিনের মধ্যেই এদের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। দু'একটা ষ্টেশনে যখন গাড়ী দাঁড়াচ্ছিল তখন কেমন অদ্ভুত খেয়াল হচ্ছিল, এখানেই নেমে পড়ি। তারপর? তারপর যা হবার তা হবে। কতলোকতো এমনি করে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে, আবার অনেকে শেষও হয়ে গেছে। আমিও যে প্রতিষ্ঠা পাবো না, তারই বা কি প্রমাণ আছে? নেমে পড়ি, তবে এবার কোন আত্মীয়-স্বজনের বা পরিচিত জনের মধ্যে নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে মিলিয়ে যাবো। কিন্তু কাপুরুষ আমি তা পারলাম কই। বনগাঁ এসে কিছু সময় গাড়ীর মধ্যে বসে থাকলাম। তারপর এক সময় গাড়ী থেকে নেমে প্লাটফর্মে পায়চারি করছি। কত মানুষের আনাগোনা, কত ব্যস্ততা, কত উৎকণ্ঠা, কত ক্লান্তি, অথচ গতি স্তব্ধ হয় না। বিরাট একটা যন্ত্রের সঙ্গে এ মানুষগুলো যেন বল্টু মেরে আটকানো। যন্ত্রটা যেন দুর্বার বেগে ঘুরছে। মানুষগুলোও ঘুরছে। বেরিয়ে আস্‌তে চাইলেও যে উপায় নেই। সে যে বল্টু মারা। কিন্তু এই বৃহৎ ও মহৎ কর্মযজ্ঞের আমিতো শরীক হতে পারলাম না। এ আমার ব্যর্থতা; এ আমার অকর্মন্যতা। আবার ভাবলাম, না! ফিরে গিয়েই ভালো হ'লো। ওখানেও শ্রম দিতে হবে; কিন্তু ওখানে যেমন একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পাবো, যে প্রাণটা এখানে কারোর কাছেই খুলে ধরতে পারলাম না, ওখানে হয়তো কিছু লোকের কাছে খুলে ধরা যাবে। আমার আজন্মের স্মৃতি জড়ান পথঘাট, নদীনালা, খালবিল, গাছপালা, মাঠঘাট, মানুষজন, বন্ধুবান্ধব আমাকে চায়। রক্তের মধ্যে তাদের টান বোধ করি। কেমন করে ওদের থেকে এতদিন আমি দূরে পড়ে আছি! এ কী! আবার এ দশ মাসের মধ্যেই এখানকার সাথে এ কেমন নিবিড় সম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠ্‌লো? এখানকার পথঘাট,

দ্রুতগামী যাতায়াত ব্যবস্থা, কর্মপ্রবাহ, পড়াশুনা ও জ্ঞানচর্চার বহুব্যাপ্ত সুযোগ, প্রগতিশীল রাজনীতি, নতুন সমাজ গড়াও প্রত্যয় আমাকে যেতে বারণ করে। এ বলিষ্ঠ প্রত্যয়তো ওখানে সুদূর পরাহত। আমিতো এ সমস্যার সমাধান করতে পারছিনা। চলে যাবো? থেকে গেলে কেমন হয়? না, চলেই যাই। না না, গিয়ে আর কী হবে? থেকে যাই না। মাথার শিরাগুলো টনটন করে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। অন্ধকার ঘরে যেন একা পায়চারি করি। একা বোবা জন্তুর মতো আপন যন্ত্রণায় আপনি ধুকি, প্রকাশ করে ভারমুক্ত হতে পারিনা।

হাতমুখ কেমন শুকিয়ে আসছিল। তাই কলের জলে হাত দুটো ভালো করে ধুয়ে ফেললাম। জানালা দিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে কিছু ধুলো বালি নিশ্চয় আমার নাকে মুখে এসে পড়েছে। তাই মাথায় একটু জল দিয়ে পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলটা আঁচড়িয়ে নিলাম। ট্রেন ছাড়ার আর বেশী দেরী নেই। তাই ট্রেনের কামরায় উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, একটু পরেইতো সীমান্ত ছাড়িয়ে চলে যাবো। এবার যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা অনুভব করলাম। বুকের ভেতর কাঁপিয়ে দিয়ে কয়লার ট্রেনের বাঁশী বেজে উঠলো, যাত্রা শুরু করলো ট্রেনটা অজগরের মতো। হঠাৎ এক নম্বর প্লাটফর্মের দিক থেকে একটা হৈ চৈ ওঠায় চেয়ে দেখলাম, জলস্রোতের মতো একদল শরণার্থী এসে ওখানে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, আর ঐ দলের মধ্যেই আমাদের নিজ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর অনেক একান্ত পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। ওদের রুক্ষশুষ্ক চেহারা ও ক্লান্ত দেহ। আমি অবাক-বিস্ময়ে ওদিকে চেয়ে থাকলাম, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ীর গতি দ্রুততর হয়েছে।

—*—

অমৃতস্য পুত্রাঃ

বুঝলে না? মানুষ হলো অমৃতস্য পুত্রাঃ। অর্থাৎ মানুষ অমৃতের সন্তান। ভগবান পরম অমৃতময়, আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ তাঁরই সন্তান। পিতাপুত্রের যে-সম্পর্ক ভগবান আর মানুষেও সেই সম্পর্ক। বুঝলে তো?

আষাঢ় মাস! আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। ঝর ঝর করে জল ঝরছে। বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই কর্মহীন গ্রামবাসীদের ছ'সাত-জন এসে জুটেছে আটচালা ঘরে। সেখানে জ্যাঠামশাই ঢালা বিছানার ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় গড়গড়ায় বড় নল লাগিয়ে তামাক টানছেন, আর নিষ্কর্মা মানুষদের কাছে তার বক্তব্য রাখছেন। জ্যাঠামশাই ছিনে জমিদার। তিনি আবার গ্রামে কমন জ্যাঠামশাই। প্রায় সবাই-ই তাকে জ্যাঠামশাই বলে। এমনও দেখা যায় যে, বাবাও জ্যাঠামশাই বলছে ছেলেও জ্যাঠামশাই বলছে। এজন্য কখনও তিনি রাগ করছেন বলে শোনা যায়নি। সাদাসিধে মানুষটিকে সবাই ভালোই বাসে। তিনি বলেই চলেছেন—এই যে মানুষ, এ হল পরম সত্য। মানুষের মধ্যে ভগবান বিরাজ করেন বলেই তো মানুষ সত্য। ছ্যাখোনা মানুষ কতো মহৎ কাজ করে? একজন মানুষ কত অকাতরে প্রাণ দেয়! একটা লোক জলে ডুবে মরছে, আর একজন ঝাপ দিয়ে পড়ছে তাকে বাঁচানোর জন্য। সে কিন্তু চিন্তা করে না যে, সে-ও ডুবে মরতে পারে। ঘরে আগুন লেগে যাওয়ায় একজন হয়তো আটকা পড়ে গেছে। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে আগুন-লাগা ঘরে ঢুকে পড়ছে কেউ বা আটকে-পড়া লোকটাকে বের করে আনার উদ্দেশ্যে। তা হলে দেখতে পাচ্ছ তো, মানুষ কত মহান, কত আত্মোৎসর্গপরায়ণ? এটা কেন? সে অমৃতের সন্তান বলেই এমন সম্ভব।

শ্রোতারা উৎকর্ণ হয়ে শোনে। মানুষ সম্পর্কে তাদের মনে বড় ধারণা সৃষ্টি হয়। চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

ছোট বেলায় জ্যাঠামশাইর এমন অনেক বক্তৃতা শুনেছি। ভালো করে অনেক কথাই হৃদয়ঙ্গম হয়নি। তবে মানুষের সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধার ভাব মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। তাই উত্তরকালে কখনও মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা দেখলে দারুণ মনঃকষ্ট বোধ করেছি। মানুষের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা পোষণ করায় জীবনে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। কোথাও কখনও ঠকিনি তা-ও নয়, তবে সেটাকে ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরে নিয়েছি। তবু মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইনি। এ শিক্ষা বোধ হয় জ্যাঠামশাইর কাছে শুনে শুনেই মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

বয়স বেড়েছে। একদিকে যেমন অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে চারিত্রিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছি, তেমনি বহু চরিত্র সম্পর্কে নানা ভাষায় নানা কথাও পড়েছি। শেক্সপীয়ারের "ওথেলো" নাটকে ইয়াগো চরিত্র পড়ে অনেকদিন গভীর রাত পর্যন্ত চিন্তা করেছি। ইয়াগোকে অদ্ভুত মনে হয়েছে। তার সর্পিল মানসিকতার আঁকা বাঁকা গতি কতই না ভাবিয়েছে। জোনাথান সুইফ্‌ট "গালিভারস ট্রাভেলস্" এমানুষকে 'ইয়াহু' বলায় তাঁকে নরবিদ্বেষী অপবাদই শুধু দেওয়া হয়নি, অনেক অপ্রীতিকর সমালোচনাই তাঁকে শুনতে হয়েছে। আমারও ভালো লাগেনি মানুষকে ইয়াহুর পর্যায়ে নামিয়ে নেওয়ায়। বারবার প্রশ্ন জেগেছে, মানুষ কি ইয়াগো? মানুষ কি ইয়াহু?

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্যও তো মানুষ। আবার ইয়াগো 'ইয়াহু'ও তো মানুষ। তবে কি এটা সৃষ্টির বৈচিত্র্য? যাক এসব কথা!

সেদিন ছিল প্রথম শীতের অন্ধকার রাত। দূরে গিয়েছিলাম। বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে গেছে। একাকীই এত রাতে পথ চলছি বলে গা-টা একটু ছমছম করছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে একবার সামনে, একবার পিছনে তাকাচ্ছিলাম, যদি কাউকে সঙ্গী পাওয়া যায়। আমার কাছে কোন আলো ছিল না। হঠাৎ মনে হলো, প্রায় শ' দু'য়েক হাত দূরত্বে কোন

একজন লোক আমারই আগে আগে যাচ্ছে। আমি ওকে ধরার জন্য দ্রুত পা চালালাম। ক্রমশ ব্যবধান কমে আসতে লাগলো। হঠাৎ একটা বড় শব্দ হলো! আমি থমকে দাঁড়ালাম। লক্ষ্য করলাম ঐ লোকটি একরকম ছুটেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। আমি আবার চলতে লাগলাম। একটু এগিয়ে দেখি, পথের পার্শ্বে সদ্যোনির্মিত সমাধি সৌধটির সামনের দিকে, অর্থাৎ রাস্তার ধারে যে বেড়ার দেওয়ালটি সারা-দিন ধরে রাজমিস্ত্রীরা গেঁথেছে, সেই দেওয়ালটি আগাগোড়া ভূপাতিত। ইস্! কত দেব-দেবীর মূর্তিই না ওতে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি স্পষ্টতঃই অনুভব করলাম যে, সামনের পথিকটিই এ অপকর্মটির সংঘটক। এ স্থানে বেশী সময় থাকাটা নিরাপদ নয় মনে করে সরে এলাম। কিন্তু খুব আপসোস হল এমন জঘন্য কাজের চাক্ষুষ দ্রষ্টা হয়ে। নানাদিক ভেবে ঘটনাটা কারোর কাছে আর প্রকাশ করলাম না।

এ ঘটনার বছর দু'য়েক পরে একদিন রাত আটটা ন'টার দিকে বাড়ীতে এক প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় কুমোর পাড়ার দিক থেকে সমবেত কণ্ঠের একটা আর্ত-চিৎকার শুনে উঠানে নেমে এলাম। দেখলাম উত্তর আকাশ লাল হয়ে আগুনের লেলিহান শিখা উঠেছে। দু'জনেই ছুটে গেলাম। সে এক করুণ কাণ্ড। গরীব কুমোরেরা পৌষ মাসে জমি থেকে ধানের খড় এনে গাদা করে রেখেছে। বলা প্রয়োজন, আমাদের ঐ অঞ্চলে ধানের এক এক গাছা খড় আট দশ হাত বা তারও চেয়ে বেশী লম্বা হয়ে থাকে। ঐ খড় দিয়ে ওরা পণিতে মাটির জিনিস-পত্র পোড়াবে। রাস্তার কাছেই পাহাড় প্রমাণ খড়ের গাদা। ফাল্গুন মাসের খরা। ঐ গাদায় আগুন লেগেছে। বহু মানুষের প্রাণপণ চেষ্টায় না বাঁচান গেল খড়ের গাদা, না বাঁচান গেল ৬/৭ টা ঘর। দরিদ্র মানুষের বুকফাটা কান্নায় মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। সবাই বুঝতে পারলো যে, যে-কেউ আগুনটা লাগিয়েছে, আপনা থেকে লাগেনি!

আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোকের কলাগাছের চাষ করা ছিল নেশা। তিনি সিঙ্গাপুরী কলার চারা কোথা থেকে যোগাড় করে,

পুঁতলেন। কি কি সার দিলেন। যথাসময়ে প্রথমে একটা গাছে এক ছড়া কলা ধরলো। গাছটার চাইতে কলাছড়া বড় হলো। ভদ্রলোক মাটিতে গর্ত করে গর্তের মধ্যে খড় বিছিয়ে দিলেন। এমন একটা নাম-ডাক পড়ে গেল যে অনেকেই কলাছড়া দেখতে আসতে লাগলো। আমিতো দেখে ভারী আনন্দ পেলাম। কি করে চাষ করেছেন তা-ও জেনে নিলাম। ভবিষ্যতে এমন একটা চাষের স্বপ্নও দেখতে শুরু করে দিলাম। হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখা গেলো, কলাগাছটার মাঝামাঝি জায়গাটা কাটা। আর মাসখানেক পরেই কলাছড়া পাকার উপযুক্ত হতো। ভদ্রলোক যে কী ভীষণ দুঃখ পেলেন তা বলার মতো নয়।

সেবার হাট থেকে একটা আমড়ার চারা এনে পুঁতলাম। কত স্বপ্নই না রচনা করলাম গাছটিকে ঘিরে। বিরাট একটা গাছ হবে। ডাল-পালায় ভরে যাবে প্রাঙ্গণ। বড় বড় থোকায় আমড়া ফলবে। গাছটা তরতর করে বড় হয়ে উঠলো। বছর দুই কেটে গেল। ইতিমধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে চারাটা। শুকনো মৌসুমে কত কষ্ট করে ওর গোড়ায় জল ঢেলে ওকে সতেজ রাখি। একদিন সকালে মায়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে দেখি আমার সাধের আমড়া গাছটার মাজাটা ভেঙে পড়ে আছে। একেবারে দু'ভাগ। সত্যিই সেদিন কান্না এসেছিল সখের গাছটার দ্বিখণ্ডিত অবস্থা দেখে।

মেঝো কাকীমার মিষ্টি কুমড়োর গাছের সেবার খুব নামডাক পড়ে গেলো। একটা কুমড়ো এত বড় হল যে, যে দেখে সেই বলে, ওটা পাকিয়ে রেখে দেবেন। সামনের ফেব্রুয়ারীতে যখন কৃষি প্রদর্শনী হবে জিলাসহরে, তখন ওটা জমা দেবেন। নিশ্চয় পুরস্কার পাওয়া যাবে। সত্যি বলতে কি, সে এক কুম্ভকর্ণের মুণ্ডু। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কুমড়োটার বোঁটার দিকটায় খানিকটা বোঁটার সাথে আছে, আর নীচের অংশটা গলে পড়ে গেছে। অর্থাৎ ভেতরটা পচে গেছে। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা গেল যে, কুমড়োটার তলা দিয়ে কে যেন একটা পেরেক ঢুকিয়ে রেখেছে।

এতসব ঘটনা পরপর ঘটায় গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। যা

হোক একটা বিহিত করার জন্য দফায় দফায় বৈঠক হলো। কিন্তু সুরাহা কিছুই হল না। কারণ দীর্ঘ বিরতির পরে এক একটা ঘটনা হঠাৎ ঘটে যায়। কাজেই পাহারা দিয়ে কিছু সুবিধে হবে না। সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হলো যে, যে-কোন একটি লোকই এই অপকর্মের নায়ক। তাকে ধরা দরকার। ধরা তো দরকার, কিন্তু ধরা কিভাবে? গ্রামে একজন আধপাগলা ভবঘুরে ছিল। তাকে ধরে আনা হলো। অনেক ভাবে তাকে জেরা করেও কিছু বের করা গেল না। ওকে মারধোর করেও ভয় দেখানো হল। যাদের ক্ষতি হয়ে গেছে তাদের তো আক্রোশ সীমাহীন। কিন্তু পাগলের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা আস্তে আস্তে একরকম চাপাই পড়ে গেল।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়। খুব শীত পড়েছে। আমাদের বাড়ীর সামনে বড় পুকুরটার জল জেলেরা সেঁচে ফেলেছে। গত চোদ্দ পনেরদিন ধরে ওরা ক্রমাগত জল সেঁচে আজ একেবারে পুকুরের মাঝখানে সামান্য জল রেখেছে। কালকে সকালে মাছ ধরা হবে। এ বছর মাছও পড়েছে প্রচুর। জেলেদের আনন্দ আর ধরে না।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। সন্ধ্যার পরে গ্রামের অন্য প্রান্তে এক বন্ধুর বাড়ীতে গেলাম আড্ডা মারতে। রাত যখন গোটা সাড়ে নয় বাজে তখন আড্ডা ভেঙে গেল। বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। কোন আলোই সাথে নেই। অন্ধকারে পথ চলছি। প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছি। এমন সময় হঠাৎ একটা চিৎকার উঠলো। গ্যালো, গ্যালো! সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জলকল্লোল কানে এলো। শব্দটা আমাদের বড় পুকুরের যানের দিক থেকেই আসছে। যানের ওপাশেইতো খাল। সন্ধ্যায় দেখেছি জোয়ারে খাল কানায় কানায় ভরা। বোধ হয় পুকুরের যানের বাঁধ ছুটে গেছে।

কিন্তু চিৎকারটাতো অন্যরকম মনে হচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, এই দিকে গ্যাছে, এই দিকে গ্যাছে। চীৎকার শুনে মনে হলো, আমি যেখানটায় রাস্তার ওপর দাঁড়ানো তার পাশের জঙ্গলের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

পুকুরের ঘান ও রাস্তার মাঝখানে একটা বড় জঙ্গল। ওর মধ্য দিয়েই একটা সরু পথ আছে। দিনের বেলায়ও ওপথে হাটতে ভয় করে। দু'পাশের গাছপালার লতাপাতা রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। দিনেও বড় একটা কেউ হাটে না। আমি ঐ রাস্তাটার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম, কেউ যদি এই বুনো পথ দিয়ে আসে, তবে এই রাস্তায়ই এসে উঠবে। জেলেদের সর্বনাশের কথা চিন্তা করে মাথায় কি যেন একটা খেলে গেল। অসুরের শক্তি বোধ করলাম। প্রস্তুত হয়ে গেলাম একটা কিছু করার জন্ত। হঠাৎ অনুভব করলাম, কেউ এ পথ ধরেই এগিয়ে আসছে। বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠলো। যা ঘটে ভাগ্যে, রাস্তার মুখে এলেই দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জোরে চীৎকার করে উঠতে গেলাম—ধরেছি। আমি ধরে ফেলেছি।

কিন্তু চীৎকার করার আগেই ধূর্ত ব্যক্তিটি আমাকেও দু'হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে তার গালটা দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে মিনতি ভরা কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌লো, আমাকে ছেড়ে দে, আর কোনদিন এমন কাজ করবো না। আমি তোর পায় ধরছি।

বল্‌তে বল্‌তে আমাকে ঠেলে ঠেলে রাস্তার ওপর উঠে রাস্তাটা পার হয়ে অপর দিকের নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে ক্রমাগত ঢুকে যেতে লাগলো। আমি না পারছি চীৎকার করতে, না পারছি ওকে প্রতিরোধ করতে। ওই জঙ্গলে সাপখোপ বা বিষাক্ত পোকামাকড় থাকতে পারে। অথচ আমাকে ঠেলে নিয়েই যাচ্ছে। কোন খারাপ মতলব নেইতো? না, তাই বা কি করে হবে? আমার সঙ্গে গায়ের জোরে কিছুতেই পারবে না।

জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে, অর্থাৎ নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে বুকের ভেতর ভীষণভাবে তোলপাড় করছিলো।

ওদিকে পুকুর পাড় আলোয় ও লোকজনে ভরে গেছে। চীৎকার চেচামেচি ও বিলাপ চলছে। দরিদ্র জেলেদের হাহাকার নৈশ আকাশে যেন আছড়ে পড়ছে। পুকুরের সন্নিকটস্থ বাগানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে সবাই। আর এই নিবিড় জঙ্গলের ভয়ঙ্কর পরিবেশে সূচীভেদ্য অন্ধকারের

মধ্যে দু'টি মানুষ পরস্পরকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। একজন চাইছে মুক্তি, অন্য জন মুক্তি দিতে নারাজ। আমি বললাম—

—কুমোর পাড়ায় আগুন দিয়েছিল কে ?

—আমি।

—সমাধির দেওয়াল ভাঙা ?

—তা-ও !

—কলাগাছ কাটা ? আমড়া গাছ ?······

—সব, সব। সব কাজই আমার। ভাবছিলাম কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু আইজ ধরা পইড়্যা গেলাম। এইবারটি আমারে ক্ষমা কর। আর কোনদিন এ কাজ করব না। ভবিষ্যতে এমন হইলে তুই সব প্রকাশ কইর‍্যা দিস।

—কিন্তু এখন ছেড়ে দিলে ভবিষ্যতে তো আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

—না না। আর এমন কাজ জীবনে করবো না। এই শ্যাষ। তুই যদি প্রকাশ করস, তয় গলায় দঁড়ি দেব। বলেই হাউ হাউ করে, কিন্তু চাপা গলায় কেঁদে দিল।

—বল্, প্রকাশ করবি না। বল্, কথা দে।

—আর কোনদিন এমনটি হবে না তো ?

—না না, আর কখনও করবো না।

—তবে এতদিন কেন হল ?

—দারুণ আনন্দ পাই এইসব কাজে। এ আনন্দ বুঝান যাবে না।

—আনন্দ !

—হ ! আনন্দ। দারুণ আনন্দ। ভীষণ ভালো লাগে।

আমি কি বলব, বুঝে উঠতে পারলাম না। এমন জঘন্য কাজ যাকে আনন্দ দেয় তার কথা বিশ্বাস করা নিতান্তই বোকামি। এটা বিপজ্জনক কাজ ছাড়া আর কি ? হিংস্র বাঘকে খাঁচায় বন্দী করে ছেড়ে দিলে কি সেই গল্পের বামুনের মত অবস্থা হবে না ? আমার মনে হল, একটা

ভয়ঙ্কর অজগর আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্যাঁচিয়ে ধরে তার ভীষণ বিষাক্ত জিব বের করে দংশন করতে উদ্যত হয়েছে। একটা অব্যক্ত ভীতি প্রথমটায় আমাকে মুসড়ে দিতে চাইলো। পরক্ষণে কোথা দিয়ে কেমন করে একটা অজ্ঞাত শক্তি আমাকে বলীয়ান করে তুল্লো। এ জঘন্য পরিবেশে, সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সহসা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলাম। মনে হল, আমি আজ কালীয় দমনের নায়ক ঘনশ্যাম বইতো নই। আমাকে উত্তেজনায় হাফাতে দেখে সে আরও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। ওদিকে উত্তেজিত জনতার রুদ্ররোষ হয়তো রাস্তার এপাশের জঙ্গলেও আছড়ে পড়তে পারে। তাই এত অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতিতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বল্লাম—

ঠিক আছে। এবারের মতন আর কাউকে কিছু বলব না, জ্যাঠামশাই।

::সঃ::মাঃ:প্রঃ::